ভুল হইয়া গিয়াছে। আমি একান্ত প্রয়োজনে ঠেকিয়া আপনার টাকাগুলি খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমার হাতে টাকা নাই, কোথা হইতে উগরাইয়া দিব?

আমি বলিঃ "তুমি উগরাইও না। কিন্তু সেই বেচারার তো তোমার কথা শুনিয়া নাড়িভুঁড়ি উল্‌টিয়া গিয়াছে।"

**চাঁদার টাকা আত্মসাৎ করাঃ** সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষ মসজিদের জন্য চাঁদা আদায় করিয়া তাহাও আত্মসাৎ করিয়া বসে। এক ব্যক্তি মসজিদের চাঁদা আদায় করিত। কিছু টাকা একত্রিত হইলে তাহা খাইয়া শেষ করিয়া পুনরায় চাঁদা চাহিতে লাগিত। কেহ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, পূর্বের টাকা কোথায় গেল? তখন সে শপথ করিয়া বলিয়া দিত, মসজিদে লাগাইয়াছি। তাহার এক প্রতিবেশী বলিয়া উঠিলঃ যালেম! মিথ্যা শপথ করিও না, তুমি কোথায় মসজিদে লাগাইতেছ? তখন সে তাহাকে বলিলঃ আস, আমার সাথে চল, দেখাইয়া দিতেছি। অতঃপর মসজিদে যাইয়া টাকা মসজিদের দেওয়ালের সঙ্গে লাগাইয়া দিল এবং বলিলঃ ইহার উপরই শপথ করিয়া থাকি যে, মসজিদে লাগাইতেছি। ব্যাস্, মসজিদের দেওয়ালের সহিত লাগাইয়া দেই।

আজকালের চাঁদা আদায়কারীদের এই অবস্থা। ইস্‌লামী কার্যের জন্য আদায়কৃত চাঁদার কোনই হিসাব-কিতাব নাই। প্রত্যেকেই যদৃচ্ছা খরচ করিয়া ফেলে। স্মরণ রাখিবেন, ফেকাহর কিতাবে লিখিত আছে—তিন পয়সার পরিবর্তে সাত শত কবূলযোগ্য নামায কর্তন করা হইবে। দুনিয়ার মধ্যে খুব স্ফূর্তি করিয়া লও, আখেরাতে ইহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

বাস্তবিকপক্ষে পাক-ভারতের লোক চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারে খুবই সাহসী। ইঁহারা সকলকেই অহরহ চাঁদা দান করিয়া থাকেন। যাহাহউক, ইঁহারা তো নিজ নিজ দানের সওয়াব প্রাপ্ত হইবেন। কেননা, তাঁহাদের নিয়ত ভাল। কিন্তু আদায়কারীরা আখেরাতে যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করিবে। যাহারা এইভাবে মুসলমানদের টাকা-পয়সা বিনাশ করিতেছে।

হাঁ, এক অবস্থায় চাঁদাদাতাগণও সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবেন। যদি দাতা জানিতে পারেন যে, এই আদায়কারী চাঁদা আদায় করিয়া যথাস্থানে ব্যয় করে না। এমতাবস্থায় জানিয়া-শুনিয়া এরূপ ব্যক্তির হাতে চাঁদা দান করিলে কোনই সওয়াব হইবে না। কেননা, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে চাঁদা আদায় করা হারাম। এরূপ ব্যক্তিকে দান করিলে এই দুষ্কর্মে তাহার সাহস বাড়িয়া যায়। হারাম কার্যে সাহায্য করাও হারাম। দুঃখের বিষয়, মানুষ কত অভিনব উপায়ে মানুষকে ধোঁকা দিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু স্মরণ রাখিও, খোদার দরবারে ধোঁকা চলিবে না।

زنہار ازاں قوم نباشی کہ فریبند ۔ حق را بسجودے ونبی را بدرودے

"সাবধান! সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইও না, যাহারা আল্লাহ্ তা'আলাকে সজ্‌দা দ্বারা এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দরূদ দ্বারা ধোঁকা দিয়া থাকে।" মাওলানা বলেনঃ

خلق را گیرم کہ بفریبی تمام ۔ در غلط اندازی تا ہر خاص وعام
کارہا با خلق آری جملہ راست ۔ با خدا تزویر وحیلہ کے رواست
کار با او راست باید داشتن ۔ رایت اخلاص وصدق افراشتن

"আমি দেখিতেছি, মানুষ পূর্ণ ধোঁকাবাজ। মানুষের সঙ্গে কাজ-কারবার ভালই চলে, তবে খোদার সঙ্গে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি কেমন করিয়া চলিতে পারে? তাঁহার সঙ্গেও কাজ-কারবার বা ব্যাপার-বিধান পূর্ণ, সততা ও অকপটতার সহিত হওয়া উচিত।"

আমার একটি ঘটনা মনে পড়িয়াছে। কোন এক মাদ্রাসার সভায় ওয়ায করার জন্য আমি উপস্থিত ছিলাম। তৎকালে বলকানের জন্য সাহায্য আদায় করা হইত। আমার ওয়ায শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষেপে বলকানের জন্য সভায় চাঁদা প্রার্থনা করিল। ইহাতে জনৈক পেন্‌শনপ্রাপ্ত তহসীলদার একশত টাকা দান করিলেন। আমি বাহিরে যাইতেছিলাম। একস্থানে কতিপয় লোক দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া উক্ত একশত টাকা দানের কথা জানিতে পারিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ "জাযাকাল্লাহ্" বলিলাম। ইহাই আমার অপরাধ ছিল, এই অপরাধেই দাতা পরে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ঘটনা এই ঘটিয়াছিল যে, তহসীলদার সাহেব আদায়কারীদিগকে চাপ দিয়াছিলেন, "আমার একশত টাকার রসিদ পৃথকভাবে কাটিয়া দেওয়া হউক।" আদায়কারীরা এই দাবী অনর্থক মনে করিয়া সেদিকে কর্ণপাত করিল না। যখন তিনি নিরাশ হইয়া গেলেন—যেহেতু আমি "জাযাকাল্লাহ্" বলিয়াছিলাম, এই অপরাধে আমাকে ধরিয়া বসিলেন। আমার একশত টাকার রসিদ পৃথক আনাইয়া দিন। আমি এক বন্ধু দ্বারা তাঁহাকে লিখিলাম—আপনি যাহাদিগকে চাঁদা দিয়াছেন তাহাদের নিকট রসিদ তলব করুন, আমার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি পুনরায় আমাকে চিঠি লিখিলেনঃ হযরত! আমার রসিদ দিন, নয়তো আমার টাকা ফেরত দিন; অন্যথায় আমি আদালতের আশ্রয় লইব। আমি চাঁদা আদায়কারীদিগকে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া বলিলামঃ তাহার টাকা ফেরত দাও। তাহারা জানাইল, টাকা তো রওয়ানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অগত্যা ঝগড়া মিটাইবার উদ্দেশ্যে নিজ তহবিল হইতে একশত টাকা এক বন্ধুর মারফতে তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু তথাকার আমার বন্ধুবর্গ নিজেদের তহবিল হইতে উক্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই আমার টাকা ফেরত দিতে চাহিলেন। আমি অস্বীকার করিলাম। উভয়পক্ষ হইতে জেদ ও অস্বীকার বাড়িতে থাকিল। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত টাকা একটি সৎকাজে ব্যয় করিয়া দেওয়া হইল।

তখন একজন বিজ্ঞ আলেম আমাকে বলিলেনঃ আপনি উক্ত টাকা নিজ তহবিল হইতে কেন দিলেন? সেই খাতে আরও চাঁদা তো আসিতেছিল। তাহা হইতে তহসীলদারের একশত টাকা ফেরত দিতে পারিতেন। আমি বলিলামঃ আপনার এই ফতওয়ায় আমি বিস্মিত হইলাম। অপরের টাকা সেই ব্যক্তিকে দেওয়া আমার পক্ষে কেমন করিয়া জায়েয হইত? মানুষ কি আমাকে এই উদ্দেশ্যে টাকা দিয়াছে? আপনি ভাবিয়া দেখুন, আপনি আমাকে উক্ত উদ্দেশে চাঁদা দান করিলে যদি আমি এইরূপে ব্যয় করিতাম—আপনি কি তাহা পছন্দ করিতেন? কখনই না। তবে অপরের টাকা সম্বন্ধে আপনি আমাকে এরূপ পরামর্শ কেন দিতেছেন? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই পরামর্শদাতা একজন মুদার্‌রেস এবং মুফ্‌তীও ছিলেন।

**ধর্মকে সুযোগ-সুবিধার অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছেঃ** এইরূপে মানুষ আজকাল ধর্মকে নিজের পার্থিব উদ্দেশ্য এবং সুযোগ-সুবিধার অধীন বানাইয়া রাখিয়াছে। আরও একটি ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি। এজ্‌তেহাদের দাবীদার জনৈক আলেম এক

ব্যক্তির শাশুড়ীকে হালাল করিয়া দিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি তাহার শাশুড়ীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে হতভাগা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া শাশুড়ীকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিল। আলেমদের নিকট ফতওয়া চাহিলে সকলেই একবাক্যে তাহা হারাম বলিয়া হুকুম দিলেন। কিন্তু অর্থলোভী এক মৌলবী একহাজার টাকার বিনিময়ে ফতওয়া দিল যে, শাশুড়ীকে বিবাহ করা জায়েয। কিন্তু অকাট্য দলিল দ্বারা যেহেতু শাশুড়ী হারাম বলিয়া প্রমাণ রহিয়াছেঃ وَأُمَّهَاتُ نِسَآءِكُمْ সুতরাং সে এই ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিল যে, আজকাল স্ত্রী জাতি সাধারণত মূর্খ হইয়া থাকে। এই কারণে অনেক সময়ে তাহারা কুফরী কালাম উচ্চারণ করিয়া বসে। তাহার বিবাহিতা স্ত্রীও তদ্রূপ কুফরী কালাম বলিয়া থাকিবে, যদ্দরুন তাহার ঈমান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ বিবাহকালে নূতন করিয়া তাহার ঈমান দুরুস্ত করিয়া লওয়া হয় নাই। সুতরাং উক্ত স্ত্রীলোকের সহিত তাহার বিবাহই শুদ্ধ হয় নাই। কাজেই বিবাহিতা স্ত্রীর মাতা তাহার শাশুড়ীও হয় নাই। বাকী রহিল সহবাসকৃতা স্ত্রীর মাতা হারাম হওয়া—তাহা শুধু ইমাম আবু হানীফার মত। আমি তাহা মানি না, ইহার বিপরীতপক্ষে বহু হাদীস রহিয়াছে।

মোটকথা, সে গোলমেলে প্রমাণ দ্বারা শাশুড়ীকে হালাল করিয়া দিল—শুধু হাজার টাকার লোভে। সর্বনাশা লোভ এই তথাকথিত আলেমকে ধর্মের উপরও হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী করিয়া দিল। লোভ বড় বিপদ, লোভের বশবর্তী হইয়া মানুষ করিতে পারে না এমন কাজ নাই।

আরও একটি সূক্ষ্ম কথা এখানে স্মরণ রাখার যোগ্য। অমিতব্যয়ী লোকই অধিক লোভী হইয়া থাকে। কৃপণ লোক শুধু অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি লোভী হয়; কিন্তু সে পরের দ্রব্য আত্মসাতের ব্যাপারে খুবই পরহেযগার হইয়া থাকে। সে কাহারও ধন স্পর্শ করে না। পক্ষান্তরে অপব্যয়ী লোক পরের দ্রব্যকে হালাল মনে করিয়া থাকে। অতএব, আমি বলি, আজকাল অপব্যয়ী লোক অপেক্ষা কৃপণ লোক ভাল। অপব্যয়ী লোক পরের হক্ নষ্ট করিয়া থাকে—আর কৃপণ লোক শুধু আল্লাহ্‌র হক্‌ই নষ্ট করে। অতএব, কৃপণ ব্যক্তির কার্যজনিত ক্ষতি তাহাতেই সীমাবদ্ধ, অন্য পর্যন্ত পৌঁছে না।

এইরূপে কোন কোন মানুষ কাহারও নিকট হইতে ধার লইয়া পরিশোধ করিতে জানে না। মুযাফ্‌ফরনগরে এক ব্যক্তি কোন এক সওদাগর হইতে দশ টাকা ধার করিয়াছিল; কিন্তু দেওয়ার নাম নাই। একেবারে হজম করিয়া বসিল। সওদাগর প্রথম প্রথম তাগাদা করিলে টালবাহানা করিত। কিন্তু এক বৎসরকাল অতীত হওয়ার পর বলিতে লাগিলঃ যাও, কি করযের তাগাদা করিয়া বেড়াইতেছ? তোমার নিকট আমার লিখিত কোন প্রমাণ আছে কি? থাকিলে দেখাও। নচেৎ যাও, আমি দিব না। এখন বেচারা লিখিত প্রমাণ কোথা হইতে আনিবে? সে তো বিশ্বাসের উপর এমনি ধার দিয়াছিল। এই ব্যাপারের ফল এই দাঁড়াইল যে, সওদাগর লোকটি ভবিষ্যতে আর কখনও কাহাকেও ধার দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। ফলকথা, লেন-দেনের ব্যাপারে যে ইত্যাকার বিশ্বাসঘাতকতা চলিয়াছে, ইহা বর্ণনাতীত।

تن همه داغ داغ شد پنبه کجا کجا نهم

"সর্বশরীরে ক্ষত, কত জায়গায় পট্টি লাগাইব?"

**খাছ লোকদের অপকর্মঃ** একটি দুইটি কথা হইলে বর্ণনা করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে তো আপাদমস্তক নিকৃষ্ট অবস্থা। আম (সাধারণ) এবং খাছ (বিশিষ্ট) সকলেরই লেন-দেনের ব্যাপার

জঘন্য। খাছ লোকদের অবস্থা এই যে, তাঁহারা কাহারও আতিথ্য গ্রহণ করিলে আরও অনাহূত লোককে ডাকিয়া আনিয়া দস্তরখানে বসাইয়া লন। প্রথমত, অন্যান্য লোকের উচিত আহারের সময় মজলিস হইতে সরিয়া পড়া। যদি সরিয়া না পড়ে, তবে মেহ্মানের পক্ষে সকলকে ডাকিয়া দস্তরখানে বসাইয়া লওয়া কখনও জায়েয নহে। গৃহস্বামীর অনুমতি ভিন্ন অপর লোককে দস্তরখানে বসাইবার আপনার কি অধিকার আছে?

বলিতে পারেন, গৃহস্বামী ইহাতে অসন্তুষ্ট হয় না; বরং খুশীই হয়। ইহা একেবারে ভুল কথা। কেননা, প্রত্যেকেই মেহমানের পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অধিক লোক বসিলে তাহার অসন্তোষ অবশ্যই হইবে। সে অসন্তুষ্ট না হইলেও তাহার ঘরের লোকেরা নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবে। কেননা, তাহাদের জন্য আবার নূতন করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। মেয়েদের রীতি—তাহারা নিজেদের জন্য পুনরায় চুলায় আগুন জ্বালে না। কোন সময় খাদ্যের অভাব পড়িলে তাহারা উপবাসই থাকিয়া যায়। বস্তুত নিজের পরিবারস্থ লোকের কষ্ট কেহই বরদাশ্ত করিতে পারে না। কিন্তু খাছ লোকেরা এবিষয়ে মোটেই চিন্তা করেন না। দস্তরখানে বসিয়া তাঁহারা পুরা মজলিসের লোককে ডাকিয়া বসাইয়া দেন এবং মন্তব্য করেন—উপস্থিত লোকদিগকে না ডাকিয়া নিজে একাকী আহার করা লজ্জার কথা।

দুঃখের বিষয়, তাঁহারা খোদার কাছে লজ্জাবোধ করেন না। এমন লজ্জাবোধ করিলে তাঁহাদের উচিত, নিজের পয়সায় বাজার হইতে খাদ্য আনাইয়া লোকদিগকে খাইতে দেওয়া। তাহা হইলে যত ইচ্ছা লোক ডাকিয়া খাওয়াইতে থাকুন, আপত্তি নাই। কিন্তু ইন্শাআল্লাহ্! তাঁহাদিগকে এরূপ বলা হইলে আর একজনকেও ডাকিয়া বসাইবেন না।

একবার আমার বাড়ীতে কোন একজন আলেম লোক মেহ্মান হইলেন। নিয়ম অনুযায়ী তাঁহার জন্য ঘর হইতে খাদ্য কিছু বেশী পরিমাণেই পাঠান হইল। তথায় আর একজন লোক ছিলেন, যিনি আমার মেহ্মান নহেন। খাদ্য আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা কিছু বেশী দেখিয়া আমার আলেম মেহ্মান উক্ত লোকটিকে দস্তরখানে ডাকিলেন। আমার চাকর বলিল, এই খাদ্যে আপনার মালিকানাস্বত্ব নাই; বরং আপনাকে খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আপনি যত ইচ্ছা খাইতে পারেন। যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, ঘরে ফেরত যাইবে। আর একজনকে এই খাদ্যে শরীক করার অধিকার আপনার নাই। আলেম মেহ্মান বলিতে লাগিলেনঃ আমি ঘর হইতে আর খাদ্য চাহিব না। দুইজনে ইহাই আহার করিব। যেই পরিমাণ খাদ্য ঘর হইতে আমার জন্য আসিয়াছে, ইহাতে আমার অধিকার আছে। ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ খাইতেও পারি কিংবা ফেরতও দিতে পারি কিংবা অপর কাহাকেও খাওয়াইয়াও দিতে পারি।

আমার চাকর বলিলঃ মেহ্মানের জন্য ঘর হইতে খাদ্য কিছু অধিক পরিমাণেই পাঠাইবার নিয়ম, যেন মেহ্মানের কম না হয়। কিন্তু উহাতে মেহমানকে মালিকানাস্বত্ব দেওয়া হয় না। শুধু খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আপনি সম্পূর্ণ খাইতে পারেন—তাহার অনুমতি আছে। কিন্তু খাওয়ায় নিজের সহিত অপরকে শামিল করার অনুমতি আপনাকে দেওয়া হয় নাই। আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করিলে হযরত মাওলানা ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন! তিনি বলিলেনঃ হাঁ, জিজ্ঞাসা করিব।

অথচ এই মাসআলাটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার। পাঠ্য কিতাবেই বর্তমান আছে, কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন হয় না। তথাপি উক্ত আলেম ছাহেবের তাহা খেয়াল হয় নাই। শেষ

পর্যন্ত আমার চাকরকে নির্লজ্জের মত বলিয়া দিতে হইল। তদুপরি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি জিজ্ঞাসাও করেন নাই। অবশেষে আমি তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম, ফকীহ্‌গণ পরিষ্কার লিখিয়াছেন, মেহ্‌মানকে খাওয়ার অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও খাদ্য-দ্রব্যের মালিকানাস্বত্ব গৃহস্বামীরই থাকে। গৃহস্বামী মেহ্‌মানের লোকমা উগরাইয়া লইতে চাহিলে সেই অধিকারও তাহার আছে। অবশ্য দান করিলে খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণকারী ব্যক্তির স্বত্বাধীন হইয়া যায়। যেমন, কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সমস্ত খাদ্য বাড়ী বাড়ী পাঠান হয়, তাহাতে গ্রহণকারী মালিক হইয়া যায়। কিন্তু মেহ্‌মানের সম্মুখে যে খাদ্য পেশ করা হয়, তাহাতে মেহ্‌মানের স্বত্ব জন্মে না। উহাতে শুধু খাওয়ার অনুমতি থাকে ; যত ইচ্ছা খাইতে পারে। অবশিষ্ট মালিকের ঘরে ফেরত যাইবে, কিন্তু আজকাল অনেক আলেমও এ বিষয় লক্ষ্য করেন না।

ইহার এক কারণ এই যে, এসমস্ত বিষয়ের প্রতি স্বভাবত শরীফ খান্দানের লোকেরাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। অপরের দ্রব্যে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাদের নিজেদের নিকটই লজ্জাবোধ হয়। পক্ষান্তরে নিম্ন সমাজের লোকের মধ্যে লোভের একটু আধিক্য থাকে। আর আজকাল শরীফ খান্দানের লোকেরা এল্‌মে দ্বীন শিক্ষার প্রতি মনোযোগ ছাড়িয়া দিয়াছেন। অধিকাংশ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা করিয়া থাকে। কাজেই তাহাদের স্বভাব তো এইরূপই হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছেন। শিক্ষা উহাকে কিছুটা সংশোধন করিলেও সমূলে পরিবর্তন করিতে পারে না। এই কারণেই নওয়াব সাআদাত আলী খান কোন কোন শ্রেণীর লোককে চাকুরীতে নিযুক্ত করিতেন না। তিনি বলিতেন ঃ এ সমস্ত সমাজের লোক স্বভাবত অধিক ঘুষখোর হইয়া থাকে। সেই শ্রেণীর জনৈক ব্যক্তি চাকুরীপ্রার্থী হইয়া উক্ত নওয়াব সাহেবের সমীপে দরখাস্ত পেশ করিলে তিনি উপরোক্ত কারণ দর্শাইলেন। তখন চাকুরীপ্রার্থী নওয়াব সাহেবের সেই নীতির উপর কটাক্ষ করিয়া এই কবিতাটি লিখিলেন ঃ

نه هر زن زنست ونه هر مرد مرد ـ خدا پنج انگشت یکسـاں نه کرد

"প্রত্যেক স্ত্রীলোকই স্ত্রীলোক হয় না এবং প্রত্যেক পুরুষও পুরুষ হয় না। আল্লাহ্ তাআলা পাঁচ অঙ্গুলি এক সমান করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।

অর্থাৎ, "আপনি যে সেই শ্রেণীর সমস্ত লোককে সমান মনে করিতেছেন, ইহা ভুল। সকলে সমান নহে।" সাআদাত আলী খান কৌতুক কথার ন্যায় উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ

وقت خوردن همه یکساں می شوند "খাওয়ার সময়ে সবগুলি অঙ্গুলিই এক সমান হইয়া যায়।"

অর্থাৎ, তুমি যে বলিতেছ, পাঁচ অঙ্গুলি সমান সৃষ্টি করা হয় নাই, ইহা ঠিক ; কিন্তু খাওয়ার সময়ে সবগুলি সমান হইয়া যায়। কেননা, সমস্ত অঙ্গুলির মাথা সমান করিয়াই লোক্‌মা ধরা হয়। ব্যাস্, মিঞা ছাহেব বোধহয় লজ্জায় মরিয়া গেলেন।

**স্বভাব সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ঃ** আমি বলি, আলেমদের স্বভাব সংশোধন করিয়া লওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। আমাদের ওখানকার জনৈক বুযুর্গ লোক কাহারও বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইলেন। খাওয়ার সময় তাঁহাকে ডাকা হইলে তাঁহার মজলিসের সকলেই তাঁহার সঙ্গে চলিল।

এ সম্বন্ধে গ্রাম্য লোকেরা বেশ চালু হইয়া থাকে। খাওয়ার নাম শুনিতেই দৌড়াইতে আরম্ভ করে। সকলে যাইয়া খাওয়ার মজলিসে বসিলে গৃহস্বামী নম্রতার সহিত সকলকে বলিল ঃ "আপনারাও খাওয়ায় শরীক হউন। খাওয়ার অভাব হইবে না।" কিছুসংখ্যক লোক অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমরা তো শুধু হযরতের সঙ্গে এমনি আসিয়াছি। আমরা খাদ্য গ্রহণ করিব না।" গৃহস্বামী নীরব রহিল। তখন বুযুর্গ লোক বলেন ঃ একজন মুসলমান যখন মহব্বতের সহিত বলিতেছেন, তখন তোমরা অস্বীকার কর কেন? সোব্হানাল্লাহ্! কেহ যদি সেই গরীবকে জিজ্ঞাসা করিত, সে কেমন মহব্বতের সহিত বলিয়াছিল? সে তো শুধু লৌকিকতার খাতিরে বলিয়াছিল—এসমস্ত লোক যখন আমার বাড়ীতে একেবারে খাওয়ার সময় আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাদিগকে খাওয়ার জন্য সমাদর না করা এবং তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা না করা লোকাচার মতে নিন্দনীয়। অন্যথায় ইহা স্পষ্ট কথা—যে ব্যক্তি দশ-পাঁচ জন লোকের জন্য খাওয়ার আয়োজন করিতেছে, সে এত বড় জনতাকে মহব্বতের সহিত কেমন করিয়া দাওয়াত করিতে পারে? যাহারা এমনভাবে আসিয়া মেহ্মান হইয়া বসিয়াছে—যেমন কথিত আছে ঃ "مان نہ مان میں تیرا مہمان" —"স্বীকার কর আর নাই কর, আমি তোমার মেহ্মান।"

মোটকথা, বুযুর্গ লোকটির আদেশ অনুযায়ী সকলেই হাত ধুইয়া খাইতে বসিয়া গেল। ফলে খাদ্যদ্রব্য কম পড়িয়া গেল। গৃহস্বামী তাহার ভাইয়ের বাড়ী হইতে খাদ্য আনাইয়া লইল, তাহাতেও কুলাইল না। অবশেষে বাজার হইতে খরিদ করিয়া আনা হইল। সকলের সম্মুখে বেচারা লজ্জা পাইল। কেননা, তাহার ঘর হইতে সকলের খাওয়া জুটিল না। বেশ তিক্ততার সৃষ্টি হইল। পরে কেহ কেহ উক্ত বুযুর্গ লোকের দুর্নাম করিল। তিনি আল্লাহ্র ভয় একটুও মনে স্থান দিলেন না। এত বড় জনতা পরের বাড়ীতে আনিয়া হাযির করিলেন।

বন্ধুগণ! এমন অন্যায় আচরণে সকলের মনেই কষ্ট হয়, যদিও কেহ লজ্জার কারণে প্রকাশ করে না। আমার নিজেরই এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একবার কোন এক সমিতির তরফ হইতে আমাকে দাওয়াত করা হইয়াছিল। আমি সফরের খরচ ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করি নাই। ভাড়াও থার্ড ক্লাসেরই লইয়াছি। তাহাও সমিতির ফাণ্ড হইতে লই নাই; বরং দাওয়াতকারী নির্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত আমার পূর্ব হইতেই শর্ত স্থির হইয়াছিল। তিনি নিজ তহবিল হইতে আমাকে খরচ দিয়াছেন। তিনি অতিরিক্ত দিতে চাহিলে আমি গ্রহণ করি নাই। খাওয়ার বেলায়ও আড়ম্বর করিতে আমি নিষেধ করিয়া দিয়াছি। এই ব্যবহারে সমিতির লোকেরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং সমিতির সেক্রেটারী আমার সম্মুখে জনৈক ওয়ায়েযের দুর্নাম করিয়া বলিল ঃ হযরত! তিনি তো একদিনে এগার টাকার পান খাইয়া গিয়াছেন। একজন লোকে অবশ্য এগার টাকার পান খাইতে পারে না। ব্যাপার এই হইয়াছিল যে, তাঁহার সঙ্গে যত লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল, সকলকে প্রচুর পরিমাণে পান খাওয়াইয়াছেন। তখন অবশ্য কেহ কিছু বলে নাই। কিন্তু পরে দুর্নাম মুখে আসিয়াই পড়িয়াছে।

আমি মনে মনে বলিলাম, আপনি যে আমাকে অধিক টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, যদি আমি তাহা গ্রহণ করিতাম, তবে আপনি পরের দিন আমারও এরূপ দুর্নাম করিতেন। বাস্তবিক-পক্ষে এহেন অবস্থায় গৃহস্বামীর যেরূপ কষ্ট হয় তাহাতে দুর্নাম মনে আসিয়াই পড়ে। আল্হামদু লিল্লাহ্। আমি পানও খাই না, চা-ও পান করি না। নাশ্তারও অভ্যাস করি নাই, যাহাতে অতিথি

সৎকারকের কোন কষ্টই না হয়। একস্থানে খাওয়ার পরে এই মনে করিয়া পান চাহিয়া লইলাম, যেন গৃহস্বামী আমার সংকোচহীনতায় খুশী হয়, কিন্তু গৃহস্বামী খুব উত্তম করিয়াছেন। পরিষ্কার জবাব দিয়াছেন, আমাদের এখানে পান নাই, কেহই খায় না। প্রকৃতপক্ষে পানের খরচ বাহুল্য ব্যয় ছাড়া কিছুই নহে। ইহাতে গৃহস্বামীর বেশ খরচ হয়। কিন্তু কাহারও প্রতি ইহা তাহার কোন এহ্‌সান গণ্য হয় না। কেননা, প্রত্যেকেই মনে করে, আমি মাত্র সামান্য এক টুকরাই তো খাইয়াছি। কিন্তু একশত লোককে এক টুক্‌রা করিয়া দিতে গৃহস্বামীর কয়েক টাকাই ব্যয় হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন খাদ্য খাওয়ার জন্য সময় নির্ধারিত থাকে দিনে রাত্রে দুইবার। আর পান খাওয়ার জন্য কোন সময়ই নির্দিষ্ট নাই। আমার ধারণা—কোন কোন সময় পানের খরচ খাওয়ার খরচের চেয়ে অধিক হইয়া যায়।

কাজেই এই অপ্রয়োজনীয় খরচ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। যদি কোন মেহ্‌মানের জন্য পান হাযির করা হয়, তবে তাঁহার নিকটে উপস্থিত সকল লোককে তাহা হইতে বিতরণ করা মেহ্‌মানের পক্ষে জায়েয নহে। কিংবা মেহমানের পক্ষে তাহাদের জন্য গৃহস্বামীকে ফরমায়েশ করিয়া পান আনাইয়া দেওয়াও জায়েয নহে। ইহাতে কোন কোন সময় গৃহস্বামীর মনে কষ্ট হইয়া থাকে।

এই কারণে আমি সফরে মাত্র একজন লোক সঙ্গে লইয়া থাকি। তাহা পূর্বাহ্নেই দাওয়াতকারীকে জানাইয়া দেই, যাহাতে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। দাওয়াতকারীর উপর শুধু আমার এবং আর এক ব্যক্তির দায়িত্ব থাকে। পরে কখনও পথে যদি কেহ আমার মহব্বতে সঙ্গী হইতে ইচ্ছা করে, তবে আমি তাহাকে পরিষ্কার বলিয়া দেই—আপনি নিজের ব্যবস্থা নিজে করিবেন। আমার থাকার ব্যবস্থা যেখানে হইবে আপনি সেখানে থাকিবেনও না; বরং হোটেল বা অন্য যেখানে আরামপ্রদ হয়, থাকার ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। বাজার হইতে নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। কেবল সকালে ও সন্ধ্যায় সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিবেন। যাহাতে দাওয়াতকারী বুঝিতে না পারে যে, আপনি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন। অতঃপর যদি সে নিজে আপনাকে দাওয়াত করে, তবে আপনি নিজের সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া তাহা মঞ্জুর করিবেন অথবা না-মঞ্জুর করিবেন। আমার সঙ্গী হিসাবে সেখানে খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। যদি কোন সময় কোন দাওয়াতকারী আমাকে বলে, আপনার সাথী লোকদিগকে দাওয়াত করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমি পরিষ্কার বলিয়া দেই—আমার সাথী কেহ নাই। আমি কাহাকেও ডাকিয়া আনি নাই। আপনি তাহাদিগকে দাওয়াত করিতে হইলে নিজে তাহাদিগকে বলুন এবং শুধু আপনার নিজের সম্পর্কের ভিত্তিতে যাহা ইচ্ছা করুন। ইহার জন্য আমার উপর কোন এহ্‌সান মনে করিবেন না। আমি তাহাদিগকে কিছু বলিতে চাই না। আমার সাধারণ অভ্যাস এইরূপ। হাঁ, কেহ একান্ত অন্তরঙ্গ হইলে সেক্ষেত্রে এই নীতি রক্ষা করিয়া চলি না।

একবার জৌনপুরে বহু লোক আমার সঙ্গী হইয়া গেল এবং সকলেই বাজার হইতে নিজ নিজ ব্যবস্থা করিত। দাওয়াতকারীর ইচ্ছা ছিল সকলে তাঁহার বাড়ীতেই আহার করুক। কিন্তু আমার সঙ্গীগণ তাহাতে সম্মত হইল না। জনৈক আলেম আমার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল; জনাব! আপনার সঙ্গীগণকে আপনার সহিত এখানে আহার করিতে বলিয়া দিন। তাহারা অন্যত্র খাইলে গৃহস্বামীর মনে কষ্ট হয়। আমি বলিলামঃ "মাওলানা! আপনি নীরব থাকুন। আমি এই লৌকিক

মনঃকষ্টকে প্রকৃত কষ্ট অপেক্ষা হাল্কা মনে করি; যাহা এত লোকের ব্যবস্থা করিতে গৃহস্বামীর এবং তাহার পরিবারস্থ লোকের ভোগ করিতে হইবে এবং কেহ কেহ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন।

এখন শুনুন, পরের গৃহে তো মাওলানা এরূপ মন্তব্য করিলেন, কিন্তু যখন আমাকে নিজ গৃহে দাওয়াত করিলেন, তখন শুধু আমাকে এবং সঙ্গীগণের মধ্য হইতে তাঁহার এক পুরাতন বন্ধুকে দাওয়াত করিলেন। অবশিষ্ট সঙ্গীগণের মধ্যে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন না এবং বলিতে লাগিলেনঃ ঘরে অসুস্থ, কাজেই সকলকে দাওয়াত করিতে পারিলাম না। আমি মনে মনে বলিলাম, পরের গৃহে মন্তব্য করার বেলায়তো আপনার একথা মনে পড়িল না যে, এই বেচারার ঘরেও কোন অসুবিধা থাকিতে পারে। এতদ্ভিন্ন মাওলানা যদি আমার সঙ্গীদিগকে দাওয়াত করিতে ইচ্ছা করিতেন, তবে ঘরে সম্ভব না হইলে বাজার হইতেও ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, বরং আমার ধারণা—মাওলানা যখন দেখিয়াছেন যে, কাহারও দাওয়াতে আমি সঙ্গীগণকে সঙ্গে লই না। এই কারণেই মাওলানা আমাকে দাওয়াত করিতে সাহস করিয়াছেন। সমস্ত সঙ্গী আমার সঙ্গে দাওয়াতে শরীক হওয়ার দস্তুর থাকিলে মাওলানা আমাকেও দাওয়াত করিতেন না। এই কারণে মাশায়েখ ও ওলামায়ে কেরামের এসমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। নিজের সমস্ত সঙ্গীর বোঝা যেন দাওয়াতকারীর ঘাড়ে চাপাইয়া না দেন।

ফলকথা, টাকা-পয়সার লেনদেনে ও অন্যের বাড়ীতে মেহমান হওয়ার সময় গৃহস্বামীর সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে অতি অল্পই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ইহার ফলে আমাদের সামাজিক জীবন অতিশয় নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর ইহার একমাত্র কারণ, আমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতেছি।

**মান-মর্যাদার মোহ অর্থলোভ হইতেও অধিকঃ** মান-মর্যাদা অর্থ অপেক্ষাও অধিক লোভনীয়। কেননা, মান-সম্মানের প্রকৃত অধিকার অন্তরের উপর। ইহা দ্বারা অনেক বড় বড় কাজ উদ্ধার হয়। হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়াও যে কাজে সফলতা লাভ করা যায় না, একজন সম্মানী লোকের মুখের একটি কথায় সে কাজ সফল হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই কারণে মান-সম্মান কাম্য হয়, যেন উহার বদৌলত মানুষের ক্ষতি হইতে নিরাপদে থাকা যায়। অর্থাৎ, মান-সম্মানের প্রকৃত লাভ হইল ক্ষতি নিবারণ করা। কিন্তু আজকাল ইহাকে লাভ অর্জনের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয় এবং ইহার সাহায্যে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করা হয়। ফলকথা, দুনিয়ার ধন-দৌলতের মোহ যখন হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তখন দুনিয়ার মান-মর্যাদার মোহ কেন হইবে না? হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

مَاذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِىْ قَطِيْعَةِ غَنَمٍ اَفْسَدَ لَهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِلدِّيْنِ (اَوْكَمَا قَالَ)

“অর্থাৎ, বক্‌রীর পালে পতিত দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ বক্‌রীর পালের এত ক্ষতি করিতে পারে না। ধন এবং মান-সম্মানের মোহ ধর্মকে যতখানি বিনষ্ট করিতে পারে।”

ইহা হইতে বুঝিয়া লউন, মান-মর্যাদার মোহ ধর্মের কতটুকু ক্ষতি করিয়া থাকে। বস্তুত মানুষ সম্মানলাভের জন্য এমন জঘন্য কাজ করিয়া ফেলে, যাহা অর্থ উপার্জনের জন্যও করে না।

সম্মানলাভের জন্য ধর্মের বিনাশ সাংঘাতিকরূপেই করা হয়। রসম এবং অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে হাজার হাজার টাকা শুধু নামের জন্য ব্যয় করা হয়। উৎসবে এবং শোকানুষ্ঠানে কেহ নিজের ভূসম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া ফেলে। কেহ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি লাভ করিয়াছ? উত্তর করিবে, কিছুই না; কেবল একটা নাম কিনিয়াছি, বিক্রয় করিলে যাহার মূল্য দুই কড়িও হইবে না।

যাহাহউক, ইহারা দুনিয়ার বিনিময়ে এমন বস্তু খরিদ করিয়া থাকে, যাহাকে তাহারা নিজেরাও দুনিয়া বলিয়াই মনে করে। কিন্তু কেহ কেহ ধর্মের বেশ ধরিয়া দুনিয়া খরিদ করিয়া থাকে। ইহারা পূর্বোক্ত লোকদের চেয়ে অধিকতর নিকৃষ্ট। কেননা, তাহারা দুনিয়াকে দুনিয়ার বেশে অর্জন করে, কাহাকেও ধোঁকা দেয় না। আর শেষোক্ত লোকেরা ধর্মের বেশে দুনিয়া উপার্জন করে, ইহাতে তাহারা মানুষকে ধোঁকা দেয়; এমন কি কোন কোন সময় তাহারা নিজেরাও ধোঁকায় পতিত হয়। মনে করে, আমরা ধর্মের কাজ করিতেছি। যেমন, দ্বীনী এলম শিক্ষা করা সর্বোত্তম বস্তু। কিন্তু ইহাতে মানুষের কি কি উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। অধিকাংশ লোকেরই দ্বীনী এলম হাসিলের উদ্দেশ্য থাকে শুধু দুনিয়া উপার্জন করা। যদিও দ্বীনী এলমের দ্বারা দুনিয়া প্রচুর পরিমাণে অর্জিত হয় না—তবে হাঁ, ভিক্ষাবৃত্তি অবশ্যই শিক্ষা হয়। শিক্ষালাভের পর মুসলমানদের নিকট চাঁদার সওয়াল লইয়া বাহির হয়। যাহার ফলে মানের পরিবর্তে অপমান অধিক হইয়া থাকে। তথাপি কেহ কেহ শুধু এই উদ্দেশ্যে দ্বীনী এলম শিক্ষা করিয়া থাকে যে, আলেম হইয়া নিজে পৃথক একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার জন্য চাঁদা উসুল করিব। কেহ কেহ আবার চাঁদা উসুল করে না। তাহারা টাকা-পয়সা যদিও কম পায়, কিন্তু মান-সম্মান অধিক পায়। কেননা, আল্‌হামদুলিল্লাহ্! মুসলমান সমাজে আজও আলেমদের যথেষ্ট সম্মান আছে। যদি সে আলেমদের চাল-চলন অবলম্বন করে, ভিক্ষাবৃত্তি না করে—যদিও রিয়াকারীর জন্যই আলেমের চাল-চলন অবলম্বন করুক এবং তাহার দ্বীনী এলম শিক্ষার উদ্দেশ্য ইহাই হয় যে, মানুষের দৃষ্টিতে সে সম্মানিত হইবে। এই ভিক্ষাবৃত্তি না করার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে এমনিতেই আলেমের ন্যায় সম্মান লাভ হয়। অতএব, দ্বীনী এলম শিক্ষার পশ্চাতে যদি চাঁদা উসুলের নিয়ত নাও থাকে, বরং সম্মানলাভের নিয়ত করে, তাহাও দুনিয়াই বটে।

**সম্মান মোহের ফল ঃ** ধর্মের বেশে এই ধর্মীয় শিক্ষার্জণের শিক্ষার পরিণাম এই হইবে, যেমন হাদীস শরীফে আছে ঃ

يُجَآءُ بِالشَّهِيْدِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ مَاعَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ فَاسْتَشْهَدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ فُلَانٌ جَرِىٌّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ ○

অর্থাৎ, "শহীদকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে এবং তিনি তাহাকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া দিবেন, তাহা সেও স্বীকার করিবে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি এসমস্ত নেয়ামতের শোকরগুযারীতে কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে ঃ হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার রাস্তায় যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইয়াছি। আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, তুমি শুধু বাহাদুর বলিয়া খ্যাতি লাভ করার জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিলে; তোমাকে বাহাদুর বলা হইয়াছে। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হইবে—ইহাকে উপুড় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ কর, ফলত তাহাই করা হইবে।"

ثُمَّ يُجَاءُ بِالْقَارِئْ قَدْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَرَأْتَ لِيُقَالَ اِنَّكَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ فِى النَّارِ ○

"অতঃপর আলেমকে আনা হইবে, যিনি নিজে এল্ম শিখিয়া অপরকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং সুন্দররূপে কোরআন পড়িয়াছেন, আল্লাহ্ তাহাকেও যে সমস্ত নেয়ামত সে ভোগ করিয়াছে স্মরণ করাইয়া দিবেন; সে তাহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলিবেন ঃ এ সমস্ত নেয়ামতের শোকরগুযারীতে তুমি কি আমল করিয়াছ? সে উত্তর করিবে ঃ আমি এল্ম শিখিয়াছি ও অপরকে শিখাইয়াছি এবং আপনার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কোরআন শিখিয়াছি। আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলিতেছ; বরং তুমি শুধু আলেম নামে খ্যাতিলাভের জন্য এল্ম শিখিয়াছ এবং এই জন্যই কোরআনও পড়িতে, যেন তোমাকে ক্বারী বলা হয়। সবকিছুই তুমি লাভ করিয়াছ। অতঃপর এ ব্যক্তির জন্যও পূর্বোক্তরূপ নির্দেশ দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া নিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।" হাদীসের ভাষ্যমতে সেই মাওলানা ছাহেবের এই দুর্দশা হইবে, যিনি বড় সূক্ষ্মদর্শী, বিখ্যাত শিক্ষক এবং মুফ্তী ছিলেন। সহস্র সহস্র মানুষ যাঁহার মুরীদ ও অনুরক্ত ছিল এবং মুছাফাহার সময় তাঁহার হাত-পায়ে চুম্বন করা হইত। ثُمَّ يُجَاءُ بِالْجَوَّادِ

"অতঃপর দাতাকে উপস্থিত করা হইবে যাহাকে, আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন প্রকারের নেয়ামত এবং নানাবিধ ধন-দৌলত দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাহার সম্মুখেও নিজের প্রদত্ত সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করিবেন, সে তাহা স্বীকার করিবে। অতঃপর প্রশ্ন করা হইবে, এসমস্ত নেয়ামতের শোকরগুযারীতে তুমি কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে ঃ হে খোদা! যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যয় করা আপনার প্রিয় ছিল, তেমন কোন স্থানেই আমি ব্যয় না করিয়া ছাড়ি নাই। আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলিতেছ; বরং তুমি শুধু দাতা নামে লোকসমাজে খ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্যেই দান করিয়াছিলে। তুমি যথেষ্ট প্রশংসা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছ। অতঃপর ইহার সম্বন্ধেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হইবে। ফলত তাহাকেও উপুড় করিয়া টানিয়া নিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।" —মুস্‌লিম, নাসায়ী ও তিরমিযী

**কেবল ধর্মের বাহ্যিক রূপের নাম ধর্ম নহে ঃ** ভাবিয়া দেখুন, শহীদ, আলেম এবং দাতার এই দুর্দশা কেন হইল? শুধু এই জন্য যে, খোদার সন্তোষলাভের জন্য তাহারা এই আমল করে নাই। ইহাতে বুঝা যায়, শুধু ধর্মের বাহ্যিক রূপের নাম ধর্ম নহে; বরং বাহ্যিক রূপের সঙ্গে যথার্থ বিষয়ও আবশ্যক। মাওলানা বলিয়াছেন ঃ

گر بصورت آدمی انساں بدے ۔ احمد وبو جهل هم یکساں بدے

"বাহ্যিক আকারে মানুষ মানুষ হইলে আহমদ (দঃ) এবং আবু জাহল সমকক্ষ হইতেন।" অর্থাৎ, ধর্মের বাহ্যিক রূপ গণ্য হইলে কিয়ামতের দিন শহীদ, আলেম এবং দাতার এই দুর্দশা হইত না। কেননা, বাহ্যিক আকারের ধর্ম-কর্ম তাহাদের নিকট কম ছিল না। কিন্তু সারবস্তু হইতে তাহারা শূন্য ছিল। অর্থাৎ, আমলের মধ্যে নিয়ত খাঁটি ছিল না। মৌলিক বস্তু এবং উহার বাহ্যিক

রূপের মধ্যে পার্থক্য এইরূপ, যেমন প্রকৃত বাঘের আকৃতি তো দূরের কথা, উহার শব্দ কিংবা গন্ধ পাইয়াও সমস্ত প্রাণী কাঁপিয়া উঠে, জঙ্গল প্রকম্পিত হয়। পক্ষান্তরে কৃত্রিম বাঘ, যেমন মহররম মাসে কেহ কেহ বাঘের চামড়া পরিধান করিয়া বাঘ সাজিয়া থাকে, অথচ একটি নেক্‌ড়ে বাঘ কিংবা ক্ষিপ্ত কুকুর দেখিলে এই নকল বাঘই সর্বপ্রথম লেজ নামাইয়া পালাইতে থাকে। যাহারা ধর্মের বেশে দুনিয়া অর্জন করে, তাহাদেরও এই অবস্থা। মাওলানা বলেনঃ

اینکه می بینی خلاف آدم اند - نیستند آدم غلاف آدم اند

“মানব আকারে যাহাকিছু দেখিতেছ ইহারা মানবের বিপরীত। আদম নহে, আদমের খোলস।”

সেই কৃত্রিম বাঘ যেমন সত্যিকারের বাঘ নহে, বাঘের খোলসমাত্র; তদ্রূপ ধর্মের বেশে দুনিয়া সত্যিকারের ধর্ম নহে; বরং ধর্মের খোলস মাত্র। যেমন, কোন বিশ্রী বৃদ্ধা রমণী যুবতীর বেশধারণপূর্বক মনমাতান পোশাকে কোন পুরুষের সহিত বিবাহিতা হইলে, বাহিরে তো খুব রূপসী বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু পোশাক খুলিয়া ফেলিলে দেখা যাইবে, মায়ের মা নানী। কবি বলেনঃ

بس قامت خوش که زیر چادر باشد - چوں باز کنی مادر مادر باشد

“চাদরে আচ্ছাদিত অনেককেই সুন্দর গঠন বলিয়া বোধহয়, কিন্তু চাদর খুলিয়া ফেলিলে মায়েরও মায়ের মত দেখা যায়।” অর্থাৎ, বোরকাবৃত থাকা পর্যন্ত মনমাতান থাকে, কিন্তু বোরকা খুলিয়া ফেলিলে স্বরূপ প্রকাশ পায়। যাহারা খাঁটি নিয়ত ভিন্ন ধর্মের কাজ করে, তাহাদের অবস্থাও এইরূপঃ

از بروں چوں گور کافر پر حلل - واندروں قهر خدائے عز وجل
از بروں طعنه زنی بر بایزید - و ز درونت ننگ میدارد یزید

“বাহ্যিক রূপ কাফেরের কবরের ন্যায় সুসজ্জিত। অভ্যন্তর খোদার গযবের ন্যায় ভয়ঙ্কর। বাহিরের পবিত্রতা বায়েযীদ (রঃ)-কে তিরস্কার করে, কিন্তু অভ্যন্তর ইয়াযীদের জন্যও লজ্জার কারণ।”

ইহার অর্থ এই নহে যে, বাহিরের বেশ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমার বলার উদ্দেশ্য শুধু বাহ্যিক রূপ যথেষ্ট নহে; বরং বাহ্যিক আকারের সঙ্গে সত্যিকারের বস্তুও আবশ্যক। দেখুন, কেহ যদি বলে, মাটির তৈয়ারী আম কোন কাজের নহে; ইহার অর্থ এই নহে যে, আমের আকার সম্পূর্ণ নিরর্থক; বরং ইহার অর্থ এই—এই মনোরম আকৃতির সঙ্গে সত্যিকারের পদার্থও আমই যদি হয়, তবে এই আকৃতিও উত্তম। অন্যথায় এই মাটির মূর্তি লইয়া কাহার কি কাজে আসিবে? যেমন, সত্যিকারের আমের মধ্যে ইহার আকৃতিও কাম্য হইয়া থাকে, যেখানে আমের মিষ্টতা এবং স্বাদের প্রশংসা করা হয়, সেখানে ইহার মনমাতান বর্ণ এবং হালকা বাকলেরও প্রশংসা করা হয়। কেহ আপনাকে মৃত সুন্দরী স্ত্রীলোকের একখানা ফটো আনিয়া দিলে আপনি ইহাকে অনর্থক মনে করিবেন। কিন্তু তেমন সুন্দরী একজন স্ত্রীলোক জীবিত অবস্থায় পাইলে তখন আপনি তাহার সুন্দর আকৃতিকে কখনও অনর্থক মনে করিবেন না।

এইরূপেই মনে করুন, ধর্মের বাহ্যিক আকৃতিও কাম্য। কিন্তু শর্ত এই যে, ইহার সঙ্গে ধর্মের মূল পদার্থও একত্রিত থাকিতে হইবে। ধর্মের মূল বস্তুর সহিত যদি বাহ্যিক রূপ নাও থাকে, তবে তাহারা আভ্যন্তরীণ স্বভাবেই ভাল হইবেন। তাঁহাদের অন্তরে আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত, নম্রতা

এবং সংস্বভাব সব কিছুই থাকে, কিন্তু বাহ্যিক আকার হয় শরীঅতের বিপরীত। তাহাদের দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন, যেমন কেহ নিজ রূহের উপর আধিপত্য বিস্তারপূর্বক উহাকে কুকুরের দেহ-পিঞ্জরে ঢুকাইয়া দিল, রূহের উপর আধিপত্য বিস্তারের অভ্যাসের দ্বারা কেহ কেহ এরূপ ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে তিনি নিজের রূহকে অপর প্রাণীর দেহে স্থানান্তরিত করিয়া দিতে পারেন। বলাবাহুল্য, এই উপায়ে কেহ নিজের আত্মাকে কুকুরের দেহে স্থানান্তরিত করিয়া দিলে সে তখন বাহ্যিকভাবে কুকুরই হইবে, মানুষ থাকিবে না। আত্মা মানুষের হইলেও ঐ কুকুররূপী মানুষকে কেহই মানুষের সমান আসন দিবে না।

এই দৃষ্টান্ত হইতে হয়তো আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন, বাহ্যিক আকৃতিরও প্রয়োজন আছে এবং মূল বস্তুরও। মূল বস্তু ভিন্ন বাহ্যিক আকার এবং বাহ্যিক আকার ভিন্ন মূল বস্তুও যথেষ্ট নহে। (অবশ্য) এই যথেষ্ট না হওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। কেননা, মূল বস্তুবিহীন বাহ্যিক রূপ অধিকতর নিকৃষ্ট। পক্ষান্তরে বাহ্যিক রূপবিহীন মূল বস্তু তত নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু মন্দ তাহাও। খুব বুঝিয়া লউন।

**রূহ এবং দেহের সম্পর্ক ঃ** কোন তালেবে এল্‌ম প্রশ্ন করিতে পারে—হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে ঃ শহীদগণের রূহ বেহেশ্‌তে সবুজ পক্ষীসমূহের দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে থাকিবে। আর পূর্বোক্ত বর্ণনায় বুঝা যায়, মানুষের রূহ কোন প্রাণীর দেহ-পিঞ্জরে স্থানান্তরিত হইতে পারে। তখন সে মানুষ থাকিবে না ; বরং "হায়ওয়ান" হইবে। উভয় হাদীসের সম্মিলিত মর্মে ইহাই অনিবার্য হয় যে, শহীদগণ বেহেশ্‌তে মানুষ থাকিবেন না, পক্ষী হইয়া যাইবেন। ইহা মর্যাদার কথা নহে। কেননা, মানুষ পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কাজেই পক্ষী হওয়া মানুষের পক্ষে অবনতির কারণ হইবে, উন্নতির কারণ হইবে না।

ইহার উত্তর এই যে, যে সমস্ত পক্ষীর দেহে শহীদগণের রূহ অবস্থান করিবে, উহারা শুধু তাঁহাদের বাহন হইবে, প্রকৃত দেহ হইবে না। তাঁহাদের মানব দেহ থাকিবে স্বতন্ত্র। তাহাতে তাঁহাদের রূহের অবস্থান ঠিক আমাদের পাল্কী, ডুলি বা বাগ্‌গীতে আরোহণের ন্যায় হইবে। পাল্কী বা ডুলির দ্বার রুদ্ধ থাকিলে দর্শকেরা কেবল পাল্কী বা ডুলি আসিতেছে বলিয়াই দেখিতে পাইবে। আরোহীর দেহ দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তাহাতে কখনও বুঝা যাইবে না যে, পাল্কী এবং ডুলিই আরোহীর দেহ, ইহার মধ্যেই আরোহীর আত্মা ঢুকিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকেই জানে, পাল্কীর ভিতরে যে মানুষ বসিয়া রহিয়াছে তাহার দেহ পাল্কীর খাঁচা হইতে স্বতন্ত্র এবং পাল্কী শুধু তাহার বাহন। এরূপে এস্থলেও মনে করুন, বেহেশ্‌তে শহীদগণের রূহের জন্য পক্ষী-দেহ পাল্কীর সমতুল্য হইবে এবং উহার ভিতরে মানুষের রূহ্ মানব দেহ লইয়া আরোহী থাকিবে। অতএব, ইহাতে মানুষ পক্ষী হইয়া যাওয়া অনিবার্য হয় না। অবশ্য মানুষের রূহ যদি নিজের দেহ ছাড়িয়া পক্ষী-দেহের মধ্যে ঢুকিত, তবে তাহা অনিবার্য হইত। এক্ষেত্রে কিন্তু তদ্রূপ হইবে না।

এখন একটি কথা ভাবিয়া দেখার বিষয়—শহীদের রূহ্ যে মানব দেহে ঢুকিয়া পক্ষী-দেহের পিঞ্জরে আরোহণ করিবে, তাহা কোন্ মানব দেহ? উপাদানগঠিত মানব দেহ? না অন্য কোন প্রকার দেহ?

ইহার তথ্য অবগত হওয়ার জন্য 'কাশ্‌ফের' প্রয়োজন, কোরআন ও হাদীস এ সম্বন্ধে নীরব। 'কাশ্‌ফ'বিশিষ্ট ওলিগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, 'আলমে বরযখের' মধ্যে মানুষকে ইহ-জগতের দেহ-সদৃশ এক দেহ দেওয়া হইবে। প্রকৃতপক্ষে উহা এই দেহের ন্যায় উপাদানগঠিত

হইবে না ; বরং উহার সদৃশ হইবে মাত্র। কিন্তু ইহা হইতে আরও সূক্ষ্ম হইবে। এই সদৃশ দেহ শুধু আলমে বরযখের মধ্যেই দেওয়া হইবে। অতঃপর বেহেশ্‌তে ও দোযখে আবার মৌলউপাদানের দেহই প্রাপ্ত হইবে। অবশ্য আলমে বরযখের মধ্যে ইহলৌকিক দেহ প্রদান করা অসম্ভব নহে, কিন্তু কোন 'আহ্‌লে কাশ্‌ফ' তদ্রূপ দেখিতে পান নাই। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, আলমে বরযখের মধ্যে সদৃশ দেহের মাধ্যমেই মানবাত্মার শাস্তি বা শান্তি হইয়া থাকে।

সুতরাং ধর্মদ্রোহীরা যে বলে, "হাদীসে বর্ণিত কবর-আযাবের বিষয়টি আমাদের বোধগম্য হয় না ; কেননা, মানবের মৃত্যুর পর আমরা তাহার উপাদানগঠিত দেহ মাসের পর মাস ধরিয়া প্রহরা দিয়াছি, কিন্তু উহাতে আযাব বা সওয়াবের কোন লক্ষণ দেখিতে পাই নাই।" পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে ইহার উত্তর স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, আলমে বরযখের মধ্যে মানুষ ইহলৌকিক দেহেরই সদৃশ এক দেহ প্রাপ্ত হয়, যাহা উপাদানগঠিত নহে। সেই দেহের উপরই তৎকালীন আযাব বা সওয়াব হইয়া থাকে। সুতরাং ইহলৌকিক দেহে আযাব বা সওয়াব অনুভূত না হওয়ায় আযাব বা সওয়াব আদৌ হইবে না বলিয়া বুঝা যায় না। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ্ তা'আলা নিজের অনুপম কুদরত প্রকাশের নিমিত্ত কোন কোন ক্ষেত্রে ইহলৌকিক দেহের উপরই আযাব এবং সওয়াব দেখাইয়াছেন। এমন বহু ঘটনা শুনা গিয়াছে যে, কোন মৃত ব্যক্তির কবর, হইতে অগ্নিশিখা দেখা গিয়াছে। আবার কোন মৃত ব্যক্তির কবর হইতে অতি পবিত্র সুগন্ধ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং কবর আযাব সম্বন্ধীয় হাদীসের উপর কোন প্রশ্ন হইতে পারে না।

মোটকথা, আমি বলিতেছিলাম, বাহ্যিক আকারের সহিত ভিতরের এবং ভিতরের সহিত বাহিরের সামঞ্জস্যও আবশ্যক। কোন কোন মূর্খ দরবেশ এই ভুলের মধ্যে পতিত হইয়াছে যে, তাহারা ভিতরের সংশোধনের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া বাহিরের সংশোধনকে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছে। তাহারা মনে করিয়াছে—"নামাযের রূহ যেকের।" তদুপরি দাবী করিয়াছে, তাহাদের অভ্যন্তর সর্বদা যেকেরে মগ্ন, সুতরাং তাহাদের নামাযের প্রয়োজন নাই। এরূপে যাকাতের রূহ্ অভ্যন্তরকে পাক করা। অন্তরকে লোভ ও কৃপণতা হইতে মুক্ত করা। অতঃপর বলিতেছে—আমাদের স্বভাব দুরুস্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এরূপে হজ্জের রূহ্ আল্লাহ্ তা'আলার তাজাল্লী দর্শন করা। আমরা সর্বত্র আল্লাহ্‌র তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং আমাদের হজ্জেরও প্রয়োজন নাই।

স্মরণ রাখিবেন—ইহা প্রত্যক্ষ ধর্মদ্রোহিতা, ইহারা শরীঅতের আমলসমূহের রূহ কখনও দেখেই নাই। যদি তাহারা ঐসমস্ত আমলের রূহ্ উপলব্ধি করিতে পারিত, তবে উহাদের বাহ্যিক রূপকে কখনও নিষ্প্রয়োজন মনে করিত না। কেননা, প্রত্যেক আমলের রূহ্ এবং উহার বাহ্যিক রূপের সহিত এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে যে, বাহ্যিক রূপ ব্যতীত উহা কখনও উপলব্ধি হইতে পারে না। নামাযের রূহ্ শুধু 'যেকের' নহে, যেমন ইহারা মনে করিতেছে—এক বিশেষ ধরনের যেকের, যাহা কেবল নামাযের বাহ্যিক রূপের সঙ্গেই পাওয়া যাইতে পারে। এরূপে হজ্জের রূহ্ শুধু খোদার তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করা নহে ; বরং হজ্জের নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে খোদার যে তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহাই হজ্জের রূহ্। যেমন, কোন কোন ঔষধ এক বিশেষত্বের কারণে হিতকর হইয়া থাকে। সেই বিশেষত্ব উক্ত ঔষধের মধ্যেই নিহিত থাকে। অন্য কোন ঔষধে তাহা পাওয়া যাইতে পারে না। যদিও উষ্ণতা এবং শীতলতায় উভয় ঔষধই সমান। খুব অনুধাবন করুন। —('রূহুল আরওয়াহ্' নামক কিতাবে আমি এই মাস্‌আলাটিকে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছি।)

সুতরাং আমি পুনরায় বলিতেছি—বাহ্যিক আকারও অভ্যন্তর হইতে নিঃসম্পর্ক নহে, আর অভ্যন্তরও বাহিরের সহিত সম্পর্কহীন নহে; বরং উভয়ের অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকা একান্ত প্রয়োজন। যাহের ও বাতেন সম্পর্কীয় বর্ণনাটি এখানে প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আমি বলিতেছিলাম—কেহ কেহ ধর্মের বেশে দুনিয়া অর্জন করিয়া থাকে। যেমন, অনেকে দ্বীনী এল্ম শিক্ষা করে—বাহ্যত ইহা অবশ্য আখেরাতেরই কাজ। কিন্তু ইহা দ্বারা ধন-দৌলত ও মান-সম্মান অর্জন করা তাহাদের উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং এরূপ এল্মকে দুনিয়াই বলা হইবে। ইহারই নাম ধর্মের বেশে দুনিয়া অর্জন করা।

**খাঁটি নিয়তের লক্ষণঃ** বিশেষ করিয়া ঐ এল্মকে ধর্মীয় এল্ম বলা হইবে, যাহাতে খাঁটিভাবে আখেরাতের উদ্দেশ্য থাকে। আজকাল এরূপ খাঁটি নিয়তের যথেষ্ট অভাব। আল্লামা শা'রানী (রঃ) এখলাছ বা খাঁটি নিয়তের একটি লক্ষণ এই লিখিয়াছেন যে, যে কাজ তুমি করিতেছ, যদি এই কাজের লোক তোমার চেয়ে উত্তম কেহ তোমার বস্তির মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং সেই কাজটিও এরূপ হয় যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নির্দিষ্টরূপে ওয়াজেব নহে। যেমন, মস্জিদ বা মাদ্রাসার পরিচালনা কিংবা ওয়ায করা অথবা পীরী-মুরীদী করা, কোন সৎকাজের জন্য চাঁদা উসুল করা ইত্যাদি; তবে তুমি তাঁহার আগমনে আনন্দিত হও। দুঃখিত হইও না; বরং তুমি সর্বসাধারণকে এই বলিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ কর যে, "যাও, তিনি আমা হইতে উত্তম" এবং তোমার সমুদয় কাজ তাঁহার হাতে ন্যস্ত করিয়া তুমি কোন নির্জন স্থানে বসিয়া মনে মনে খোদার শোকরগুযারী করিতে থাক যে, তিনি এমন একজন লোক তোমার কার্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি আসিয়া তোমার কর্তব্য বোঝা ঘাড়ে লইয়াছেন। যদি তোমার অবস্থা এরূপ হয়, তবে বুঝিব—বাস্তবিকই তোমার নিয়ত খাঁটি আখেরাতের জন্য।

কিন্তু আজকাল কোন আলেমের বস্তির মধ্যে অপর কোন আলেম আসিয়া পড়িলে যদি তাঁহার প্রতি লোকের ঝোঁক অধিক হয়, তবে বস্তিবাসী আলেম ছাহেব জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরেন এবং অন্তরের সহিত কামনা করিতে থাকেন, এ ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ সংঘটিত হউক যাহাতে তাহার প্রতি লোকের ধারণা খারাপ হইয়া যায়। কেননা, দুই তরবারি যেমন এক খাপে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ দুই আলেমও একস্থানে থাকিতে পারে না। তিনি যেন নিজেকে وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ মনে করেন। তাই বস্তির সকল লোক কেবল তাঁহারই মুখাপেক্ষী থাকুক, অন্য কাহারও দিকে তাহাদের মুখ ফিরানই উচিত নহে। কেননা, এই বস্তিবাসীদের কেব্‌লা-কা'বা সবকিছু তো আমিই নির্ধারিত আছি। লোকে আবার অন্য দিকে নামায পড়িবে কেন? "ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজেউন।" এমতাবস্থায় তোমার নিয়ত খাঁটি আখেরাতের জন্য, ইহা কখনও বলা যাইবে না; বরং তুমি খাঁটি নিয়ত হইতে রিক্ত।

আরও দেখুন, কোন মৌলবী ছাহেব কোন মাদ্রাসায় মুদাররেসী করিতেছেন। মাদ্রাসার বার্ষিক সভার সময় তাঁহার মনে এক আনন্দ হয়। তিনি মনে করেন, ইহা ধর্মীয় আনন্দ। কেননা, নফ্‌স বলে, আমার মনে তো শুধু ধর্মকার্যের প্রসার এবং পাঠ সমাপ্তকারী তালেবে এল্মদের সার্টিফিকেট প্রদানের আনন্দই হইতেছে। নিজের কর্মকুশলতা প্রকাশের আনন্দ নহে।

আমি বলি, ইহার পরীক্ষা এরূপে হইতে পারে, সেই মৌলবী ছাহেবকে উক্ত মাদ্রাসা হইতে বিদায় করিয়া তাঁহার স্থানে অপর কাহাকেও আনিয়া বসাইয়া দেওয়া হউক এবং এই মুদাররেসের নিকট অধ্যয়নরত ছাত্রদের পাঠ সমাপনের সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য বার্ষিক সভার আয়োজন

করা হউক। তখন দেখা যাইবে, উক্ত বিদায়কৃত মৌলবী ছাহেবের মনে আনন্দ হয় কিনা। ঈমানদারীর সহিত নিজের অন্তরের খোঁজ নিয়া দেখুন—যদি তখনও তাঁহার মনে আনন্দ হয়, তবেই বুঝিতে হইবে, তাহা সত্যিকারের ধর্মীয় আনন্দ। অন্যথায় মনে করিতে হইবে, ইহা শুধু দুনিয়াবী আনন্দ। ইহার সহিত রিয়া এবং আত্মগর্বের মিশ্রণ রহিয়াছে।

আজকাল তো এরূপ অবস্থা—কোন মাওলানা ছাহেবকে মাদ্রাসা হইতে বিদায় করিয়া দেওয়ার পর তিনি সেই মাদ্রাসাকে ধ্বংস করার চেষ্টায়ই লাগিয়া যাইবেন। যদি তাহা না করেন, তবে তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ, ভবিষ্যতে এই মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় আনন্দিত হওয়া তো দূরেরই কথা।

এরূপ অনেক ঘটনা আমার সম্মুখে আসে। এক মৌলবী ছাহেব কোন মাদ্রাসায় মুদাররেস্ আছেন। যতদিন তিনি সেখানে থাকিবেন, অহরহ আমার নিকট চিঠি লিখিতে থাকিবেন, "এখানে আপনার আগমনের একান্ত প্রয়োজন, এই স্থানটিতে মূর্খতা ও বেদআত প্রচুর।" কিছুদিন পর যখন মাওলানা তথা হইতে বদ্‌লী হইয়া গেলেন, তখন মূর্খতা ও বেদআত সমস্তই বিদায় গ্রহণ করিল। এখন আর সেখানে সভা ও ওয়াযের কোনই প্রয়োজন নাই; বরং মাওলানা এখন যে স্থানে বদলী হইয়া গিয়াছেন, তথাকার চাঁদ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত মূর্খতা এবং বেদআত সেখানে গিয়া হাযির হইয়াছে। এখন এই স্থানের জন্য সভা ও ওয়াযের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

ইহার তাৎপর্য এই যে, সেই মৌলবী ছাহেবের ব্যক্তিত্বই সমস্ত মূর্খতা এবং বেদ্‌আতের আড্ডা। যেখানেই তিনি যান সেখানেই বেদ্‌আত ও মূর্খতার প্রাবল্য হয় এবং সভা, ওয়ায প্রভৃতির প্রয়োজন অনুভূত হইতে আরম্ভ করে। আসলে কিছুই নহে। পূর্বস্থানেও বেদ্‌আত এবং মূর্খতার সংশোধনের উদ্দেশ্যে সভা এবং ওয়ায অনুষ্ঠান করা হইত না। পরবর্তী স্থানেও এই উদ্দেশ্যে সভার আয়োজন করা হয় না; বরং প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, মাওলানা ছাহেব যেখানে থাকেন তথাকার মাদ্রাসা হইতে তিনি বেতন পাইয়া থাকেন। এই কারণে তাঁহার ইচ্ছা—মাদ্রাসার আমদানী ও খ্যাতি বৃদ্ধি পাক। যাহাতে তাঁহার বেতনের কখনও অভাব না হইয়া উন্নতি হয়। অন্যথায় যদি সত্যিই তিনি মূর্খতা এবং বেদ্‌আত সংশোধনের উদ্দেশ্যে সভার অনুষ্ঠান করিতেন, তবে সকলের আগে তিনি ঐ সমস্ত স্থানের চিন্তা করিতেন, যেখানকার মুসলমান কলেমাও পড়িতে জানে না। তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি হিন্দুর ন্যায় এবং বিবাহ-শাদী সবকিছু হিন্দুয়ানী নিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেননা, এরূপ স্থানে ধর্ম প্রচার করা ফরয। কিন্তু আমরা তো আজকাল এমন জায়গায় যাই, যেখানে আমাদের প্রচুর আদর-আপ্যায়ন হয়। এমন জায়গায় কে যায়? যেখানকার মুসলমান আমাদিগকে পানি পান করার জন্য গ্লাসও দিবে না। কেননা, তাহারা তো আমাদের সহিত হিন্দুদের ন্যায়ই অস্পৃশ্য আচরণ করিবে। আফসোস্।

**নফ্‌সের গোপন ধোঁকা:** বন্ধুগণ! ইহা নফ্‌সের গোপন ধোঁকা—আমরা আমাদের মাদ্রাসার সভানুষ্ঠানে আনন্দিত হওয়াকে ধর্মীয় আনন্দ মনে করিয়া থাকি। এই নফ্‌স বড়ই চতুর। কোন কোন সময় সে এমনভাবে ফুসলায় যে, স্বয়ং নফ্‌স্‌ওয়ালা লোকও তাহার এই ধোঁকা টের পায় না। যেমন, এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন সময় নফ্‌স্ এই ধোঁকা দেয় যে, নিজের কৃতকর্মের সওয়াব আমি পাইব এই ভাবিয়া আনন্দিত হয়। অপরের কার্যের সওয়াব আমি পাইব না মনে করিয়া তেমন আনন্দিত হয় না। ইহার পরীক্ষা এরূপে করা যাইতে পারে যে, যদি এমন কতকগুলি কারণ একত্রিত হয়—কাজ হয় তাহার নিজের, কিন্তু উহা অন্য কাহারও বলিয়া গণ্য হয়—তখনও কি তাহার মনে তদ্রূপই আনন্দ হইবে?

ফলকথা, আমাদের অবস্থা এই যে, আমাদের মধ্যে অনেকে দুনিয়াকে দুনিয়ার বেশেই অর্জন করিতেছে এবং তাহাতে এত নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, আখেরাতের কোন পরোয়াই নাই। আবার কেহ কেহ দুনিয়াকে ধর্মের বেশে অর্জন করিতেছে। এরূপ ব্যক্তি নিজকে ধার্মিক বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিও দুনিয়াদার। এই ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

অর্থাৎ, "তোমরা আখেরাতের জন্য চেষ্টা করিতেছ না; বরং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দান করিতেছ।" অথচ আখেরাত বহুগুণে স্থায়ী ও উত্তম।

**মূলতঃ দুনিয়া অন্বেষণ করা নিষিদ্ধ নহে ঃ** এখানে বুঝিয়া লওয়ার উপযোগী কতকগুলি সূক্ষ্ম কথা আছে—(১) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলিয়াছেন ঃ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ অর্থাৎ, "তোমরা দুনিয়ার জীবনকে (অন্য বস্তুর উপর) শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতেছ।" بَلْ تَطْلُبُوْنَ বা بَلْ تَبْتَغُوْنَ অর্থাৎ, "তোমরা দুনিয়া তলব করিতেছ" বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, শুধু দুনিয়া তলব করার কারণে অভিযোগ করেন নাই; বরং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য প্রদানের কারণে অভিযোগ করিতেছেন। সুতরাং যদি কেহ দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য না দেয়; বরং কোন ক্ষেত্রে উভয়ের বিরোধ ঘটিলে আখেরাতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, এরূপ মনোভাব লইয়া যদি কেহ দুনিয়া অর্জনে লিপ্ত হয়, তবে তাহার নিন্দা করা হয় নাই। ইহাতে নীরস দরবেশদের সংশোধন করা হইয়াছে—যাহারা দুনিয়া অর্জন করাকে সকল অবস্থায় নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকে। অতএব, খুব বুঝিয়া লউন—দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে—দুনিয়া অর্জন করিতে সরাসরি নিষেধ করা হয় নাই।

এখন মানুষের অবস্থা এই যে, কোন দরবেশ লোক বিবাহ করিলে বলা হয়, ইনি কেমন বুযুর্গ লোক! গৃহিণী গ্রহণ করিয়াছেন। বুযুর্গ লোকের স্ত্রীর কি প্রয়োজন? সোব্হানাল্লাহ্! বুযুর্গ লোকদের ফেরেশ্তা হইতে হইবে। খাইতেও পারিবেন না। বিবাহও করিতে পারিবেন না।

একবার আমি মীরাঠ গিয়াছিলাম। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আমার বিবি ছাহেবা সঙ্গে ছিলেন। মুযাফ্ফরনগরে সেই চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। কেননা, মফস্বলের শহরে চিকিৎসার বহু উপকরণের অভাব। মীরাঠে তাহা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মীরাঠের জনৈকা স্ত্রীলোক আমার নিকট বাইআত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অপর একজন স্ত্রীলোক তাহাকে বলিল ঃ "তুমি ইনির হাতে বাইআত হইও না। ইনি বিবি সঙ্গে লইয়া বেড়ান। আমাদের পীর ছাহেবের হাতে মুরীদ হও। তিনি পঞ্চাশ বৎসর যাবত নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন নাই।" উক্ত বাইআত প্রার্থিনী স্ত্রীলোকটি কিছু মাসআলা জানিত। তিনি উত্তর করিলেন ঃ "যে পীর ৫০ বৎসর যাবত স্ত্রীর সহিত কথা বলে নাই, সে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত খোদার দরবারে অপরাধী রহিয়াছে। কেননা, এত বৎসর যাবত সে স্ত্রীর হক্ নষ্ট করিতেছে, সে কিসের দরবেশ! সে তো ফাসেক।" ফলকথা, আজকাল বিবিকে সঙ্গে রাখাও দুনিয়ার শামিল করা হইতেছে।

**নবী (দঃ)-এর অভ্যাসের অনুসরণ ঃ** এরূপে অনেকে বলিয়া থাকে—এ কেমন বুযুর্গ লোক! ঠাণ্ডা পানি পান করে, আট আনা গজের (মূল্যবান) কাপড় পরিধান করে। গমের আটা ভক্ষণ করে। যবের রুটি খায় না। অথচ যব হুযূরের (দঃ) খাদ্য।

আমি বলিঃ হুযূর (দঃ) অভ্যাসবশত যব খাইতেন, না এবাদতের উদ্দেশ্যে খাইতেন? বলাবাহুল্য, এবাদতের উদ্দেশ্যে খাইতেন না। হুযূরের অভ্যাসের অনুসরণ করা আমাদের জন্য ওয়াজেব নহে। ইহার অনুসরণ না করিলে কোন গোনাহ্ও হইবে না। হুযূর (দঃ)-এর অভ্যাসের অনুসরণের ক্ষেত্রে অনুসরণকারীর স্বীয় স্বভাব-প্রকৃতি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখার অধিকার আছে। আসল কথা এই যে, হুযূর (দঃ)-এর কোন কোন অভ্যাসের অনুসরণ আমাদের সহ্যও হইবে না। এ কারণেই নবীর অভ্যাসের অনুসরণ শরীঅত আমাদের জন্য ওয়াজেব করে নাই। অবশ্য কেহ সাহস করিয়া হুযূরের অভ্যাসের অনুরূপ আমল করিতে পারিলে তাহাতে ফযীলত বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ ব্যক্তির অপরের নিন্দা করিবার অধিকার নাই।

যবের রুটি সম্বন্ধে আমার একটি ঘটনা স্মরণ পড়িয়াছে। একবার হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শেবন্দ রাহেমাহুল্লাহ্ বলিলেনঃ "আজ হইতে সুন্নত অনুযায়ী যবের রুটি আহার করিব।" যবের আটা পিষাণ হইল। কিন্তু উহাকে চাল্‌নি দ্বারা চালিলেন না। কেননা, হুযূর (দঃ) আটার মধ্যে ফুঁ মারিলে যাহাকিছু ভুষি উড়িয়া যাইত, তাহাই যথেষ্ট মনে করিতেন এবং বাকী সমস্তই গুলিয়া লইতেন। খাজা ছাহেবও তদ্রূপ করিলেন। ফলত সেই যবের রুটি খাইয়া সকলেরই পেটে ব্যথা ধরিল।

এখন তাঁহার আদব দেখুন। তিনি এরূপ বলিলেন না যে, সুন্নতের অনুসরণের ফলে এরূপ হইয়াছে; বরং বলিলেনঃ "ভাই আমাদেরই ভুল হইয়াছে যে, আমরা হুযূর (দঃ)-এর সমকক্ষতার দাবী করিয়াছিলাম এবং নিজদিগকে সেই সুন্নত পালনের উপযুক্ত মনে করিয়াছিলাম। আমরা তদুপযুক্ত ছিলাম না। এ কারণেই আমাদের কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। যিনি এই স্তরের লোক, তিনিই উক্ত সুন্নত পালন করিতে পারেন। আমরা সে স্তরের লোক নহি।" সোবহানাল্লাহ্! ইহাকেই বলে আদব।

হুযূর (দঃ)-এর মাটিতে শোয়ারও অভ্যাস ছিল। কিন্তু আজকাল মানুষের স্বভাব এরূপ হইয়াছে যে, মাটিতে শয়ন করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন কতক লোক যয়তুনের তৈল এবং চর্বি খাইতে পারে না। ইহা খাইলেই তাহাদের অসুখ হয়। অতএব, এসমস্ত সুন্নত পালন করা জরুরী নহে। কেননা, এসমস্ত অভ্যাসগত সুন্নত এবং অভ্যাসের ব্যাপারে নিজের স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে শরীঅত অধিকার দিয়াছে। এরূপে চাকুরী এবং খেত-কৃষির সাহায্যে দুনিয়া অন্বেষণ করা নিষিদ্ধ নহে। কেননা, আয়াতের মর্মে বুঝা যায়, সাধারণভাবে দুনিয়া অন্বেষণ করা হারাম নহে; বরং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হারাম। এতদ্ভিন্ন হুযূরের (দঃ) বাণী ও কার্যাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সমস্ত কাজ করা জায়েয।

**কামেল পীরের অবস্থা ঃ** কামেল পীরগণ দুর্বলমতি মুরীদদিগকে দুনিয়ার সহিত জায়েয সম্পর্ক-সমূহ ছিন্ন করিতে নির্দেশ দেন না। চাকুরী, ব্যবসায় এবং কৃষিকার্যের অবাধ অনুমতি দিয়া থাকেন। রুচিকর উত্তম খাদ্য আহার করিতে নিষেধ করেন না, অধিক ঘুমাইতেও নিষেধ করেন না। স্ত্রী-পুত্রের সহিত আমোদ-স্ফূর্তি করিতেও বারণ করেন না। অল্পমাত্রায় আহার করিবার নির্দেশও দেন না; বরং তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ও স্বভাব অনুযায়ী চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যাহার সম্বন্ধে মনে করেন যে, অল্পাহারে তাহার ক্ষতি হইবে না, তাহাকে মিতাচারের সহিত অল্পাহারের আদেশ করেন। যাহাকে দুর্বল মনে করেন, তাহাকে অল্পাহারের নির্দেশের পরিবর্তে শক্তিবর্ধক দুধ-ঘি প্রভৃতি খাওয়ারও আদেশ করেন। সেই পীরকে আনাড়ি বলিতে হইবে

যিনি সকলকে একই ছড়ি দ্বারা তাড়া করিয়া থাকেন। কোন কোন পীর নির্বিচারে বাঁধাধরা নিয়মের বশীভূত হইয়া যেকোন মুরীদ তাঁহার নিকট আসুক, অল্পাহার, অল্প নিদ্রা প্রভৃতির নির্দেশ দান করেন। ইহাতে তাহাদের মস্তিষ্ক শুষ্ক হউক না কেন, কোন পরোয়া নাই। এসমস্ত পীরকে লক্ষ্য করিয়াই মাওলানা বলিয়াছেনঃ

چار پا را قدر طاقت بار نه - بر ضعيفاں قدر همت كار نه
طفل را گر نان دهی بر جائے شیر - طفل مسکیں را ازاں نان مرده گیر

“চতুষ্পদ জন্তুর শক্তি অনুযায়ী উহার উপর বোঝা চাপাও, দুর্বল লোকের ক্ষমতানুযায়ী তাহাকে কাজের আদেশ দাও। শিশুকে যদি দুধের পরিবর্তে রুটি খাইতে দাও, তবে ইহার ফলে শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে।” অর্থাৎ, শিশুকে দুধের পরিবর্তে রুটি খাইতে দিলে সে দুই-চারি দিনের মধ্যেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে তাহার বরদাশ্‌ত শক্তি অনুযায়ী কাজের আদেশ দেওয়া উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রথম দিনই চাকুরী ছাড়িয়া সংসারত্যাগী করিয়া দিতে আরম্ভ করিও না। আরেফ শীরাযী এসমস্ত পীরের সম্বন্ধেই বলিতেছেনঃ

خستگاں را چوں طلب باشد وهمت نبود - گر تو بيداد كنى شرط مروت نه بود

“কামনা আছে কিন্তু শক্তি নাই, এরূপ মুরীদের প্রতি অবিচার করিলে তাহা মনুষ্যত্ব হইবে না।”

মানুষ ‘দীওয়ানে হাফেয’ কিতাবটিকে সাধারণ মনে করে, অথচ ইহা শুধু মারেফাতের এবং তরীকতের কথায়ই পরিপূর্ণ। ইহা ভক্তিগত কথা নহে। অন্যথায় অপর কোন গ্রন্থ হইতে তাসাওউফ সংক্রান্ত এত মাসআলা বাহির করা হউক, যাহা প্রকৃতপক্ষে তাসাওউফ শাস্ত্রের কিতাবে নাই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বিষয়বস্তু পূর্ব হইতে যেখানে সঞ্চিত থাকে, সেখান হইতেই বাহির হয়। এরূপ আরও দীওয়ান আছে, যেইগুলি দীওয়ানে হাফেযেরই অনুকরণ করিয়াছে। তথাপি উহাদের মধ্য হইতে তাসাওউফের এত মাস্‌আলা বাহির করা সম্ভব হইবে না। কেননা, ঐ সমস্ত কিতাবে পূর্ব হইতেই কোন বিষয়বস্তু সঞ্চিত ছিল না। সারকথা, আরেফ শীরাযী বলেনঃ যে সমস্ত দুর্বল লোকের অন্তরে অন্বেষণ এবং কামনা আছে, কিন্তু হিম্মতের অভাব, তাহাদিগকে তাহাদের শক্তির অনুরূপ কাজের নির্দেশ দেওয়া উচিত। শক্তির অধিক কাজের চাপ দেওয়া তাহাদের প্রতি যুলুম এবং মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক হইবে।

আমি ইদানীং এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, কম খাইয়া যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। হযরত মাওলানা গঙ্গোহীর এক মুরীদ কম খাওয়া আরম্ভ করিলে মাওলানা তাহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, “ইহাতে মস্তিষ্ক শুষ্ক হইয়া যাইবে।” সঙ্গে সঙ্গে এই হাদীসটি পড়িলেনঃ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ “শক্তিশালী মুমেন দুর্বল মুমেন অপেক্ষা উত্তম।” কেননা, শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান লোক অপরেরও সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারে। পক্ষান্তরে দুর্বল লোক নিজেই অন্যের উপর বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং অযথা আহার কমাইয়া নিজেকে দুর্বল করা ভাল নহে। পূর্ব যুগের দরবেশগণ যে বহু পরিশ্রম করিতেন বলিয়া শুনা যায়, তাঁহাদের শক্তি ছিল প্রচুর। কাজেই এত পরিশ্রমের মধ্যেও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করার কারণে তাহাদের কোন ক্ষতি হইত না বা দুর্বলতা আসিত না। তাঁহারা প্রচুর পরিশ্রমের পরেও এত কাজ করিতেন যে, আমরা

সুস্থ অবস্থায়ও উহার দশমাংশ করিতে পারি না। মাওলানা গঙ্গোহীর উক্ত মুরীদ নূরানী অক্ষরে কিছু আরবী এবারত দেখিতে পাইয়া মনে করিল, তাহার কাশ্‌ফ্ হইয়াছে এবং সে উচ্চস্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। হযরত মাওলানার নিকট তাহা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেনঃ "মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বাভাস দেখা দিয়াছে। অল্পাহার ত্যাগ কর। দুধ-ঘি প্রচুর পরিমাণে খাও এবং চিকিৎসকের দ্বারা মস্তিষ্কের চিকিৎসা করাও, অন্যথায় অল্প দিনের মধ্যেই পাগল হইয়া যাইবে।" কিন্তু তথাপি সে অল্পাহার ত্যাগ করিল না; ফলে অল্প দিন পরেই সে পুরাদস্তুর উন্মাদ হইয়া গেল, বিবস্ত্র অবস্থায় বসিয়া যেকেরের পরিবর্তে গালি-গালাজ করিতে লাগিল।

চিকিৎসকদের রীতি এই, প্রত্যেক রোগীর অবস্থা অনুযায়ী তাহার চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কামেল পীরগণ কেন তদ্রূপ করিবেন না? বোধশক্তি থাকিলে তাঁহাদের দরবারে থাকিয়া সাধারণ লোকও আমার কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন।

এক পীর ছাহেবের দরবারে এক মুরীদ সর্বাপেক্ষা অধিক আহারে অভ্যস্ত ছিল। অন্যান্য মুরীদেরা অভিযোগ করিল—অমুক মুরীদ অত্যধিক আহার করে। পীর ছাহেব তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেনঃ "ভাই! তরীকতপন্থীদের কম খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। অধিক খাওয়া উচিত নহে; বরং মিতাচার রক্ষা করিয়া আহার করা উচিত।" সে বলিলঃ "হযরত, প্রত্যেকের মিতাচার পৃথক পৃথক। আপনি আমার ইতিপূর্বেকার আসল খাদ্য সম্বন্ধে আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। তবেই বুঝিতে পারিতেন, বর্তমানে আমি যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করি, ইহাই আমার জন্য মিতাচার। আমি এখানে আসার পূর্বে প্রতি বেলা পঁচিশটি রুটি আহার করিতাম। এখন পনেরটি রুটি খাইয়া থাকি। ইহা মিতাচার হইল, না মিতাচার অপেক্ষা অধিক হইল? যাহারা খান্‌কা হইতে পাঁচটি করিয়া রুটি খায়, তাহাদের খাদ্য পূর্বে ৭/৮টি রুটি ছিল। সুতরাং এখন পাঁচ রুটি খাওয়াই তাহাদের জন্য মিতাচার।" পীর ছাহেব বলিলেনঃ "তুমি সত্যই বলিতেছ, ইহা হইতে কম খাইও না।" আর অন্যান্য মুরীদগণকে বলিয়া দিলেনঃ ভাইসকল! এ ব্যক্তি অধিক আহার করে না। নিজের খাদ্যের চেয়ে অনেক কম খায়। দেখুন, কামেল পীরের সংসর্গের ফলে ঐ সাধারণ লোকও জানিতে পারিয়াছে যে, প্রত্যেকের মিতাচার পৃথক পৃথক। সুতরাং আমার খাদ্য সেই পরিমাণ কমান উচিত নহে যে পরিমাণ অন্যান্য লোক কমাইয়াছে।

মোটকথা, শরীঅত দুনিয়া উপভোগ করিতে নিষেধ করে নাই; বরং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিতে নিষেধ করিয়াছে। অতএব, চাকুরী দ্বারাই হউক বা ব্যবসায় দ্বারাই হউক, আবশ্যক পরিমাণ দুনিয়া উপার্জন করা হারাম নহে। তবে হাঁ, ধর্ম নষ্ট করিয়া দুনিয়া অর্জন করা অবশ্যই হারাম।

**দুনিয়া কামনার প্রকারভেদঃ** এস্থলে হয়তো তালেবে এল্‌মদের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হইবে, কোরআন শরীফে তো দুনিয়া কামনা করার শর্তহীন নিন্দা করা হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ
يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○

অন্যত্র বলিয়াছেনঃ

وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ○

এসমস্ত আয়াতে দুনিয়া কামনা করারই নিন্দা করা হইয়াছে। অন্বেষণ এবং চেষ্টা তো কামনার উপরে। তাহা তো আরও অধিক নিন্দনীয়। ইহার উত্তরে আমি বলি, اَلْقُرْاٰنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهٗ بَعْضًا 'কোরআনের এক অংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা করে।' অন্যান্য আয়াতকে এ আয়াতগুলির সহিত মিলাইলে জানা যায়—এস্থলে শুধু কামনার জন্য আযাবের ধমক দেওয়া হয় নাই। অন্যথায় اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا "আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসায় হালাল করিয়াছেন এবং সুদ হারাম করিয়াছেন" কথার কোন অর্থই হইত না। দুনিয়া কামনা করা যদি বিনাশর্তে হারাম হয়, তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার অনুমতি কেন দেওয়া হইয়াছে এবং শরীঅত উৎপন্ন শস্যের উপর 'ওশর' প্রভৃতি কেন ওয়াজেব করিয়াছে? টাকা-পয়সায় এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যে যাকাত কেন ওয়াজেব করিয়াছে? দুনিয়া উপার্জন করাই যদি নিষিদ্ধ হয়, তবে এসমস্ত হক ওয়াজেব হওয়ার সুযোগ কোথা হইতে আসিবে; বরং এমতাবস্থায় পরিষ্কার বলিতে হইবে, ব্যবসায়-বাণিজ্যও নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করা এবং অধিক পশু পালন করা হারাম। অথচ কোরআন-হাদীসে কৃষি, বাণিজ্য এবং অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করার প্রতি কোনই নিষেধ নাই। অবশ্য নিষেধের পরিবর্তে উহাদের জন্য যাকাতের বিধান দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, অন্যান্য আয়াত সংযোগ করিলে এসমস্ত আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায়ঃ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ مَحَضَ الْعَاجِلَةَ "যাহারা শুধু দুনিয়া কামনা করে" তাহাদের জন্যই শাস্তির ধমক। অর্থাৎ, দুনিয়া কামনা করা দুই প্রকার। (১) শুধু দুনিয়া কামনা করা, ইহার সহিত আখেরাতের কামনা আদৌ না থাকা। ইহা অবশ্যই নিন্দনীয় এবং ইহারই উদ্দেশ্যে শাস্তির ধমক প্রদান করা হইয়াছে। (২) আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়া কামনা করা। হালাল উপায়ে ব্যবসায়, কৃষিকর্ম এবং চাকুরী এই উদ্দেশ্যে করা যে, ইহার দ্বারা হকদারগণের প্রাপ্য হক আদায় করা হইবে এবং নিরুদ্বেগে আখেরাতের কাজ করিতে থাকিবে। এতদবস্থায় প্রকৃত উদ্দেশ্য আখেরাত। দুনিয়ার কামনা উহার অধীন। ইহা নিন্দনীয়ও নহে, দণ্ডপ্রাপ্তির কারণও নহে; বরং এই শ্রেণীর দুনিয়া কামনা তো এক অর্থে ফরয। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ —বায়হাকী, তাবরানী, দায়লামী, 'মাকাসেদে হাসানাহ্' ১২৮ পৃষ্ঠা

দুনিয়ার কামনা সকল অবস্থায় নিষিদ্ধ হইলে কোরআন শরীফে উহাকে ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হইত না। অথচ ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেনঃ এই পরাজয়ের একমাত্র কারণ—যে কয়জন লোককে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) পর্বতের ঘাঁটি রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া আদেশ দিয়াছিলেন যে, আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই, কোন অবস্থাতেই তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না। কিন্তু তাঁহারা এই আদেশ মান্য করেন নাই; বরং মুসলমানদিগকে জয়ী এবং কাফেরদিগকে পরাজিত হইতে দেখিয়া পর্বতঘাঁটি প্রহরা দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না। গনীমতের মাল আহরণে লিপ্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ○

"তোমাদের অর্থাৎ, ছাহাবাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ দুনিয়া কামনা করে আর কেহ কেহ আখেরাত কামনা করে", ইহাতে ছাহাবাদের প্রতি দুনিয়া কামনার সম্বন্ধ আরোপ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ছাহাবাগণের ফযীলত ও মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত আছে, সে বুঝিতে পারে—নিন্দনীয়

কামনা তাঁহাদের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা কঠিন। ছাহাবায়ে কেরাম শুধু দুনিয়ার কামনা কখনও করিতে পারেন না। অতএব, এখানে দুনিয়া কামনার অর্থ কি? ইব্‌নে আ'তা এ আয়াতের তফসীরে বলিয়াছেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ (আখেরাতের উদ্দেশ্যে) দুনিয়া কামনা করে। আর কেহ কেহ (খালেছ) আখেরাত কামনা করে।" ইহার উপর সন্দেহ হইতে পারে—আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়া তলব করা ছাহাবাদের পক্ষে যখন নিন্দনীয় ছিল না, তবে তাঁহাদের দুনিয়া কামনা পরাজয়ের কারণ বলিয়া গণ্য হইল কেন? উত্তরে বলিতেছিঃ দুনিয়া কামনা অবশ্য মূলত নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের এজতেহাদে ভুল হওয়ার দরুন তাঁহারা রাসূল (দঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করিয়াছিলেন। এ কারণেই তাঁহাদের দুনিয়া কামনাকে নিন্দা করা হইয়াছে।

এখন পরিষ্কার হইয়া গেল যে, দুনিয়ার জন্য দুনিয়া উপার্জন করা নিন্দনীয় এবং আখেরাতের জন্য দুনিয়া অর্জন করা নিন্দনীয় নহে। সুতরাং চাকুরী, ব্যবসায় এবং কৃষিকর্ম হইতে কাহাকেও নিষেধ করা যায় না। অবশ্য এতটুকু বলা যায় যে, লক্ষ্য রাখিও—দুনিয়ার জন্য ধর্ম যেন নষ্ট না হয়।

**দুনিয়া শব্দের নিগূঢ়তত্ত্বঃ** সম্মুখের দিকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই ভ্রমের কারণ বর্ণনা করিতেছেন। আমরা যে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা 'দুনিয়া' শব্দের মধ্যেই ইহার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কেননা, دنيا শব্দটি دنو নৈকট্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ, দুনিয়ার স্বার্থ ও লাভ যেহেতু নগদ, নিকটবর্তী এবং এখনই প্রাপ্তব্য। এই কারণেই ইহাকে তোমরা আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিতেছ। বলাবাহুল্য, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আমরা এখন লাভ করিতেছি। তাহা জায়েযই হউক বা পাপজনকই হউক। এই কারণে মানুষ দুনিয়ার ভোগের প্রতি দৌড়াইতেছে। পক্ষান্তরে আখেরাতের নেয়ামত এবং ভোগ বাকী, এই কারণে সেদিকে তত আকর্ষণ নাই, যতখানি আকর্ষণ দুনিয়ার প্রতি রহিয়াছে। যেমন, এক কবি বলেনঃ

اب تو آرام سے گزرتی ھے - عاقبت کی خبر خداً جانے

দুনিয়াকামীদের এই একটি ওযর ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাও বর্ণনা করিয়া দিলেন। কি রহমত তাঁহার! আমাদের ওযরও সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন এবং কোরআনের ইহা কত বড় উচ্চাঙ্গের ভাষালঙ্কার! একটি শব্দও অতিরিক্ত এবং নিরর্থক নহে। অনেকেই হয়তো এস্থলে 'দুনিয়া' শব্দ অবলম্বনের রহস্য বুঝিতে পারেন নাই। তাহারা হয়তো এই শব্দটিকে অতিরিক্ত মনে করিয়া থাকিবেন। কিন্তু অতিরিক্ত নহে; বরং ইহাতে আমাদের ওযরের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আলেমগণ সূরা-আবাসা-এর মধ্যে اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى সম্বন্ধেও এই নিগূঢ় তত্ত্বই বর্ণনা করিয়াছেন।

ঘটনা এই যে, একবার হুযূর (দঃ)-এর মজলিসে কোরায়শ সম্প্রদায়ের বড় বড় নেতারা সমবেত ছিল। হুযূর (দঃ) তাহাদিগকে ধর্মের তব্‌লীগ করিতেছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উম্মে মাক্‌তুম নামক এক অন্ধ ছাহাবী হাযির হইয়া উচ্চ রবে বলিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! عَلِّمْنِىْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ "আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যাহা শিখাইয়াছেন, আমাকেও তাহা শিখাইয়া দিন।" এক্ষেত্রে উক্ত ছাহাবীর প্রশ্ন হুযূরের নিকট কিছুটা বিরক্তিকর মনে হইয়াছিল।

কেননা, তিনি ধারণা করিয়াছিলেন, শাখা-বিধান অপেক্ষা মূলনীতি শিক্ষাদান অগ্রগণ্য। অধিকন্তু এই ব্যক্তি তো সর্বদাই আছে, এই কোরায়শ নেতৃবৃন্দ ঘটনাক্রমেই আসিয়া গিয়াছে; এমন না হয় যে, তব্‌লীগের এমন সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয়। বিশেষত ছাহাবীকে তা'লীম দেওয়া অপেক্ষা তাহাদিগকে তব্‌লীগ অধিক জরুরী। কেননা, উক্ত ছাহাবী তো ঈমান আনয়ন করিয়াছে, অন্য সময়েও শাখাবিধান শিখিয়া লইতে পারিবে। আর ইহারা কাফের, আমার নিকট আসার কোন গরযই তো তাহাদের নাই। এখন ঘটনাক্রমে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে, সম্ভবত তব্‌লীগ করিলে তাহারা হেদায়ত গ্রহণও করিতে পারে! এই কারণে ছাহাবীর প্রশ্নে হুযূরের মনে কিছুটা বিরক্তিভাব উদয় হইয়াছিল এবং উহার লক্ষণ মুখমণ্ডলেও প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে স্নেহ মিশ্রিত তিরস্কার নাযিল হইলঃ عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى অর্থাৎ, "রাসূলের ললাট কুঞ্চিত হইল এবং তিনি মুখ ফিরাইলেন, যেহেতু তাঁহার নিকট একজন অন্ধ আসিয়াছে।"

আলেমগণ লিখিয়াছেন, اَعمى অর্থাৎ, 'অন্ধ' শব্দের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরের ওযর বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, কাহারও আগমনে আপনার ললাট কুঞ্চিত হইয়া পড়া আপনার সদয় স্বভাবের পক্ষে অতিশয় অশোভন। কেননা, আগন্তুক ব্যক্তির ইহাতে মনে কষ্ট হয়, কিন্তু উক্ত ছাহাবী যেহেতু অন্ধ ছিলেন, তিনি হুযূরের ললাট কুঞ্চন দেখিতে পান নাই। এই কারণেই এমন সময়ে হুযূরের ললাট কুঞ্চিত হইয়াছিল বা উহার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কেননা, ইহাতে অন্ধ আগন্তুকের মনে কষ্ট হয় নাই। তিনি যদি চক্ষুষ্মান হইতেন, তবে হুযূরের চেহারা মোবারকে অসন্তোষের লক্ষণ কখনও প্রকাশিত হইত না।

এখন একটি কথা এই যে, যদি ইহা হুযূরের পক্ষে ওযরই ছিল, তবে ইহার জন্য আল্লাহ্ তাঁহাকে তিরস্কার কেন করিলেন? উত্তর এই যে, হুযূরের মর্যাদা অনেক উচ্চে। তাঁহার চরিত্র পূর্ণাঙ্গ ও অতি উচ্চ শ্রেণীর হউক, ইহাই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা। অতএব, যদিও একটি বাহ্যিক কারণে উক্ত ছাহাবীর মনে হুযূরের ললাট কুঞ্চনে কষ্ট হয় নাই, কিন্তু ব্যবহারটি তো এমন হইয়াছে যে, উক্ত ছাহাবী দেখিতে পাইলে মনে কষ্ট হইত। সুতরাং হুযূরকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল—এমন কাজ যেন কখনও না করা হয়, যাহাতে হুযূরের দরবারে আগন্তুকদের মনে সামান্য মাত্রায়ও কষ্ট হইতে পারে। সোব্‌হানাল্লাহ্! কেমন সুন্দর তা'লীম!

আজকাল মানুষ লোকের সম্মুখে অসন্তোষ প্রকাশ না করাকে এখলাছ মনে করে; অথচ যদি এসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, অন্য কেহ আমার অসন্তোষ জানিতে পারিবে না, তখন কিন্তু ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা এসম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, ইহাও পূত চরিত্র-বিরোধী। এখন আর একটি প্রশ্ন বাকী থাকে যে, হুযূর যখন এমন একটি কাজে মশ্‌গূল ছিলেন, যাহা উক্ত ছাহাবীর কাজ হইতে অগ্রগণ্য ছিল, তখন উক্ত ছাহাবী কর্তৃক এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটান হুযূরের অসন্তোষের কারণ অবশ্যই ছিল। সুতরাং এই অসন্তুষ্ট হওয়ার মধ্যে হুযূর ন্যায়পন্থী ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে তিরস্কার কেন করা হইল? উক্ত ছাহাবী অসময়ে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকেই তো তিরস্কার করা উচিত ছিল।

উত্তর এই যে, اَعْمٰى অর্থাৎ 'অন্ধ' শব্দের মধ্যে উক্ত ছাহাবীর ওযরও বর্ণিত হইয়াছে যে, বেচারা অন্ধ হওয়ার কারণে জানিতে পারে নাই হুযূর তখন কি কাজে মশ্‌গূল ছিলেন। আর একটি উত্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সম্মুখের দিকে বর্ণনা করিতেছেনঃ

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى وَمَا عَلَيْكَ اَنْ لَّا يَزَّكّٰى

ইহার সারমর্ম এই যে, যে কাফেরদের তিনি তব্‌লীগ করিতেছিলেন, তাহারা উহার প্রার্থী ছিল না। শুধু হুযূরেরই কাম্য ছিল যে, তাহারা ঈমান আনয়ন করুক। কিন্তু তাহারা সত্য ধর্ম হইতে বিমুখ ছিল, পক্ষান্তরে উক্ত ছাহাবী সত্যের অন্বেষী ছিলেন। এমতাবস্থায় কাফেরদের সংশোধন ছিল নিছক ধারণা, আর ছাহাবীর সংশোধন ছিল নিঃসন্দেহ; সুতরাং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্দেহযুক্ত সংশোধনের প্রতি এত গুরুত্ব কেন প্রদান করিলেন, যাহাতে এমন সময়ে একজন সত্যান্বেষীর আগমন তাঁহার মনে কষ্টের কারণ হইল? উক্ত ছাহাবীর আগমনের সাথে সাথে যদি তাহারা চলিয়া যাইত, তবে হুযূরের কোন পরোয়াই ছিল না। তাহাদের সঙ্গে হুযূর বেপরোয়াভাব প্রদর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ ছাহাবীকে শিক্ষা প্রদানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল, যাঁহার সংশোধন ছিল সুনিশ্চিত।

সুতরাং ইহা হইতে একটি মাস্‌আলা জানা গেল যে, সুনিশ্চিত লাভকে সন্দেহজনক লাভের উপর অগ্রগণ্য মনে করা উচিত, যেমন ইব্‌নে উম্মে মাক্‌তূমের তা'লীমে একটুখানি বিলম্ব করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (দঃ)-কে তিরস্কার করিয়াছেন, অথচ এই বিলম্বের ফলে তাহা বিনষ্ট হইতেছিল না। ধর্মের মূলনীতির তা'লীমকে তখনই অগ্রগণ্য মনে করা যাইবে, যখন ফল সুনিশ্চিত বা সন্দেহজনক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মূলনীতির তা'লীম এবং শাখা-বিধানের তা'লীম সমকক্ষ হয়। অন্যথায় যাহা সুনিশ্চিত তাহাই সন্দেহজনকের উপর অগ্রগণ্য হইবে। কিন্তু আজকাল সাধারণত মুসলমান ইহার বিপরীত করিতেছে, সন্দেহজনক দুনিয়াবী স্বার্থের খাতিরে সুনিশ্চিত পারলৌকিক স্বার্থ নষ্ট করিতেছে। এই কথাটি প্রসঙ্গক্রমে মধ্যস্থলে বলিয়া ফেলিলাম। আমি বলিতেছিলাম, 'দুনিয়া' শব্দে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ওযর বর্ণনা করিয়াছেন। ধর, তোমাদের ওযরও আমি বর্ণনা করিয়া দিতেছি যে, দুনিয়ার স্বার্থ নগদ এবং সন্নিকট বলিয়া তোমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রগণ্য মনে করিতেছ, কিন্তু ইহার উত্তরও শ্রবণ কর।

**আখেরাতের অবস্থা ঃ** وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى "আখেরাত সর্বোত্তম এবং অধিক স্থায়ী" কথার মধ্যেই উক্ত ওযরের জবাব নিহিত রহিয়াছে। ইহাতে তোমাদের ওযর ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কোন লাভ কেবল নগদ হওয়া উহাকে অগ্রাধিকারদানের জন্য যথেষ্ট নহে; বরং উহার অন্য কারণও রহিয়াছে, যদিও দুনিয়ার স্বার্থ নগদ, কিন্তু ইহার বিপরীতপক্ষে আখেরাতের মধ্যে দুইটি অবস্থা রহিয়াছে। আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং অনন্তকালের জন্য স্থায়ী, সুতরাং আখেরাতের লাভ দুনিয়ার চেয়ে প্রকারেও উত্তম এবং পরিমাণেও অনেক বেশী, আবার অনন্তকালের জন্য স্থায়ীও বটে। দুনিয়ার স্বার্থ উত্তমও নহে, পরিমাণেও অধিক নহে এবং দীর্ঘকাল স্থায়ীও নহে। আখেরাতের মধ্যে যে বিশেষ দুইটি অবস্থা রহিয়াছে, ইহাদের তুলনায় দুনিয়ার শুধু নগদ গুণকে কোন জ্ঞানীই প্রাধান্য দিবে না। কেননা, একমাত্র নগদ গুণই যদি অগ্রগণ্যতার কারণ হইত, তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য কখনও চলিত না। কেননা, ব্যবসায়ে নগদ পুঁজি এখনই বিনিয়োগ করিতে হয়, অথচ ইহার লাভ থাকে ভবিষ্যতের অন্ধকারে বাকী। কিন্তু সমস্ত জ্ঞানী লোক এই কারণে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন নাই যে, ইহাতে মূলধন নগদ এবং লাভ বাকী; বরং সকলেই ভবিষ্যতের অধিক লাভের আশায় আনন্দের সহিত নগদ পুঁজি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিয়া থাকে। এখন বুঝা গেল যে, আধিক্য এবং প্রাচুর্যগুণের সম্মুখে নগদ গুণ পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং নগদ বলিয়া তোমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রগণ্য কেন মনে করিতেছ? তোমরা ইহাও কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যে, আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে কত অধিক এবং কত উত্তম?

এইরূপে বাকীর চেয়ে নগদ উত্তম হইলে কৃষিকর্মও চলিত না। কেননা, উহাতেও ভবিষ্যতের অধিক ফসলের আশায় নগদ বীজকে মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া হয়। যদি তোমরা নগদ লাভের এতই অনুরক্ত হইয়া থাক, তবে আর খেত-কৃষি করিও না। কিন্তু তাহা তোমরা কর না; বরং অধিক ফসল লাভের আশায় প্রত্যেক বৎসরই কৃষি করিয়া থাক। তবে আখেরাত এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে এই বিচার কেন করিতেছ যে, দুনিয়া নগদ এবং আখেরাত বাকী; এতটুকু চিন্তা করিতেছ না যে, আখেরাত এমন বাকী, যাহার তুলনায় দুনিয়া কিছুই নহে।

আখেরাতের আর একটি গুণ—উহা অনন্তকাল স্থায়ী। স্থায়িত্ব স্বয়ং এমন একটি গুণ, যাহার তুলনায় নগদ গুণ কিছুই নহে, পৃথিবীতে ইহার নযীর যথেষ্ট রহিয়াছে।

এক ব্যক্তি আপনাকে বাড়ী দিতে চায়—তাহার দুইটি বাড়ী আছে, একটি ক্ষুদ্র এবং কাঁচা বাড়ী। অপরটি পাকা এবং বিরাট অট্টালিকা। সে আপনাকে বলেঃ "আপনি বিরাট অট্টালিকাটি চাহিলে তাহাও দিতে পারি, কিন্তু ইহা ধারস্বরূপ পাইবেন, চারি বৎসর পরে ফেরত দিতে হইবে। কিন্তু যদি কাঁচা বাড়ীটি লইতে ইচ্ছা করেন, তবে ইহা চিরতরে আপনার মালিকানাস্বত্বে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।" এখন বলুন, আপনি কি করিবেন? নিঃসন্দেহ, প্রত্যেক জ্ঞানী মানুষই বলিবে, ধারের ক্ষণস্থায়ী বিরাট অট্টালিকা অপেক্ষা চিরস্থায়ী স্বত্ববিশিষ্ট কাঁচা ছোট বাড়ীটি উত্তম।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আখেরাতের ব্যাপারে তোমাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় না। চিরস্থায়ী আখেরাতকে তোমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য ত্যাগ করিতেছ। মানুষের আয়ুই কত? অনেকে সুস্থ অবস্থায় রাত্রে শয্যা গ্রহণ করে এবং সকালে দেখা যায়, সে মরিয়া রহিয়াছে। এই অস্থায়ী মুর্দার জন্য তোমরা নিজের আসল বাসস্থান বিনষ্ট করিতেছ, যাহা অনন্তকালের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মালিকানা-স্বত্বে দান করিতে চান। তদুপরি আরও মজার কথা এই যে, এখানকার ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টা। কেননা, আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়া তেমন মর্যাদাপূর্ণ এবং সৌন্দর্যময় স্থান নহে। আখেরাত উহা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক প্রশস্ত, অনেক বড়, অতি সুন্দর ও উচ্চস্তরের। অথচ তুমি একটি ক্ষণস্থায়ী কাঁচা বাড়ীর জন্য—যাহা কিছুকাল ব্যবহারের জন্য ধারস্বরূপ পাইতেছ, সেই ধারও বৎসর দুই বৎসরের জন্য নহে; বরং দুই-এক মুহূর্তের জন্য, কেননা, মৃত্যুর জন্য কোন নির্ধারিত সময় তোমার জানা নাই, হয়তো প্রত্যেক নিঃশ্বাসই তোমার শেষ নিঃশ্বাস হইতে পারে, এমন উত্তম ও উচ্চস্তরের মহল ত্যাগ করিতেছ যাহা অনন্তকালের জন্য তোমার মালিকানাস্বত্বে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এখন বল, তোমার সেই নগদ-বাকীর ওযর কোথায় গেল? বন্ধুগণ! দুনিয়া তোমরা দুই-এক মুহূর্তের জন্য পাইতেছ। ইহাতে কোন শান্তিও নাই, কেবল কষ্টই কষ্ট। অথচ আখেরাত অনন্ত-কালের জন্য পাওয়া যাইতেছে, সেখানে দুঃখ-কষ্টের নামও নাই। উহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বলিবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ نِ الَّذِىْٓ اَحَلَّنَا دَارَ
الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَايَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَايَمَسُّنَا فِيْهَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমাদের চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন, নিশ্চয়, আমাদের প্রভু ক্ষমাশীল এবং প্রচুর বিনিময় প্রদানকারী, যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদিগকে অনন্ত বাসগৃহে স্থান দিয়াছেন। এখানে আমাদিগকে কোন কষ্টও স্পর্শ করে না এবং কোন ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।"

আর একটি সন্দেহ রহিল—দুনিয়াপ্রার্থীরা বলিতে পারে, আমরা যে ব্যবসায় ও কৃষিকার্যে বাকী অধিক লাভকে নগদ পুঁজির উপর প্রাধান্য দান করি, তাহার কারণ এই যে, ব্যবসায় এবং কৃষিকার্যে

উক্ত বাকী লাভ ছয় মাস কিংবা এক বৎসরের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু আখেরাতের সেই বাকী লাভ কে জানে কখন পাওয়া যাইবে? ইহার উত্তরে আমি বলিব—বিলম্বে অধিক লাভের দরুন নগদকে তখনই প্রাধান্য দান করা যায়, যখন বাকী উসুল হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ নিশ্চয়তা না থাকে। কিন্তু পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকিলে দীর্ঘমেয়াদে অধিক লাভের দরুন বাকীর উপর নগদকে প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে না।

**আখেরাতের অস্তিত্ব ঃ** এখন দেখুন, আখেরাতের অস্তিত্ব নিশ্চিত না সম্ভাবনাযুক্ত? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى

অর্থাৎ, "আখেরাতের অস্তিত্ব এত নিশ্চিত যে, অসংখ্য ধারাবাহিক সংবাদের দ্বারা প্রমাণিত। হযরত ইবরাহীম এবং মূসার (আঃ) যমানা হইতে প্রত্যেক যমানায় ইহার অস্তিত্বের সংবাদ প্রদান করা হইতেছে।" সুতরাং এই ওযরও বাতিল হইয়া গেল। আর একটি উত্তর ইতিপূর্বে আমি প্রদান করিয়াছি যে, আখেরাতের অস্তিত্ব ঘটিতে কেবল তোমাদের মৃত্যুর বিলম্ব। মৃত্যুর পরক্ষণ হইতে তোমরা আখেরাতের নেয়ামতসমূহ স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। মৃত্যুর বিলম্বই বা কত? জীবনের দুই মিনিটেরও তো ভরসা নাই। সুতরাং আখেরাতকে দীর্ঘমেয়াদী বাকী বলাই ভুল।

তৃতীয় উত্তরের প্রতি এই আয়াতে ইব্‌রাহীম ও মূসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আখেরাতের কার্যাবলীর ফল সম্পূর্ণই বাকী নহে; বরং পার্থিব জীবনেও তোমরা ইহার অনেক ফল লাভ করিয়া থাক; যেমন, হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা সারা দুনিয়ার লোক অবগত আছে। তাঁহারা আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়াছিলেন, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও তাঁহাদিগকে কেমন কৃতকার্যতা, মঙ্গল, সম্মান ও শান্তি দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শত্রুদল পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইয়াছিল এবং তাঁহারা বিজয়ী ও পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। দুশ্‌মনদের নাম লওয়ার মতও কেহ অবশিষ্ট ছিল না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের নাম লওয়ার জন্য বহুসংখ্যক অনুগামী ও সম্মানকারী প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং আখেরাতের উৎকৃষ্টতা ও স্থায়িত্বের নমুনা দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাগণকে দান করিয়া থাকেন।

সারমর্ম এই হইল যে, আখেরাতকে দুনিয়ার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলে দুনিয়ার শান্তি এবং সম্মানও লাভ করা যায়। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, ফলত প্রত্যেক যমানার বরং আজকালের আখেরাত প্রত্যাশীগণও দুনিয়াদারদের অপেক্ষা অধিক শান্তি ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। দুনিয়াদারগণ তো ইহাই কামনা করে, বস্তুত তাহাও আখেরাত প্রত্যাশী লোকই অধিক লাভ করেন। এখন আর এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

সারকথা এই—দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিবেন না। অতঃপর দুনিয়া অর্জনেও নিষেধ নাই। সমস্ত কাজে শুধু এতটুকু লক্ষ্য রাখুন—আখেরাত বিনষ্ট হইতেছে কিনা। এখন দো'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাদিগকে সুষ্ঠু বোধশক্তি এবং আমলের তওফীক দান করে।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○

— ■ —

এলাহাবাদ শহর, ১০ই শাবান ১৩৪০ হিজরী

# দারুল মাস্‌উদ্

[সৌভাগ্যবানের গৃহ]

◆

সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস আছে—দুনিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তথাপি আমরা দুনিয়াকে হৃদয়ের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। ইহার কারণ শুধু এই যে, আমাদের ধারণা—মৃত্যুর পরে মানুষ এক সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার গহ্বরে আবদ্ধ থাকিবে এবং তাহাতেই একাকী অবস্থান করিবে। সে অন্ধকারের কথা কল্পনা করিয়া মানুষ ভয়ে অস্থির হইয়া যায়। অথচ এই নিঃসঙ্গতা শান্তির কারণ হইবে। বস্তুত সেই নির্জনতায় এমন আনন্দ হইবে, খোদার কসম! অপর কিছুতেই উহার সমান আনন্দ হইবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ
شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ
لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ۔ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ
بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى
الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ○

## উপক্রমণিকা

এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক নেক্‌কার পুণ্যবান বান্দাগণের স্থায়ী বাসস্থান এবং ঠিকানার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে এক আয়াতে মোটামুটিভাবে বান্দাগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন ঃ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ ইহার পূর্বে কিয়ামতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সারমর্ম এই যে, কিয়ামত অবশ্যই আসিবে। তখন প্রত্যেক মানুষকে তাহার আ'মলের বিনিময়—পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করা হইবে—তাহারই প্রসঙ্গে প্রথমত মোটামুটিভাবে বলিয়াছেন ঃ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ অর্থাৎ, তখন মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হইবে—'একদল হতভাগ্য এবং অপর দল সৌভাগ্যশালী হইবে।' অতঃপর বিস্তারিতভাবে উভয় দলের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا الخ এই আয়াতে এক দলের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহারা অনন্তকাল পর্যন্ত দোযখের অগ্নির মধ্যে আর্তনাদ করিতে থাকিবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকে। হাঁ, তবে আপনার প্রভু যদি ইচ্ছা করেন। কারণ, তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। দ্বিতীয় আয়াতে অপর দলের বিষয়ে বলিতেছেনঃ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا الخ অর্থাৎ, 'যাহারা নেককার ও পুণ্যবান, তাহারা আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকাকাল পর্যন্ত সর্বদা বেহেশ্‌তে বাস করিতে থাকিবে। হাঁ, তবে আপনার প্রভু যদি ইচ্ছা করেন।' মোটকথা, অনন্তকালের জন্য তাহাদের উপর অনুগ্রহ হইতে থাকিবে। কোন সময়ই তাহা বন্ধ হইবে না। এই হইল আলোচ্য আয়াতের তরজমার সারমর্ম।

**কবর এবং রূহের সম্পর্কঃ** এখন এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া এতটুকু ব্যক্ত করা আমার উদ্দেশ্য—মানুষ সর্বদা এই ভুল ধারণায় লিপ্ত রহিয়াছে যে, সমস্ত ভোগ ও স্বাদ দুনিয়াতেই সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। আখেরাতের, বিশেষ করিয়া কবর সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা—কবর একটি বিজন প্রান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানুষ যেহেতু আখেরাতের নেয়ামতসমূহের বিস্তৃত বিবরণ অবগত নহে, সুতরাং যদিও আলমে বরযখের বিশাল বিস্তৃত প্রান্তর কল্পনায় উদিত হয়; কিন্তু তথাকার সুখ-শান্তির কথা কল্পনাও করে না। আর যাহারা পরলোকের সুখ-শান্তির বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান রাখে—তাহারাও যেহেতু তৎবিষয়ক চিন্তা মনে উপস্থিত রাখে না—কাজেই তাহাদের মনের অবস্থাও সেই অজ্ঞ লোকেরই অনুরূপ। পরজগতকে বিজন ও ভয়ঙ্কর প্রান্তর বলিয়া তাহারাই ধারণা করে, যাহারা পরলোক সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান রাখে। পক্ষান্তরে যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের ধারণা শুধু এই যে, পরজগত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, কিয়ামতের পরে বেহেশতের কল্পনা অবশ্য তাহাদের মনেও উদিত হয়, কিন্তু কিয়ামতের পূর্বে ও মৃত্যুর পরে তাহাদের শুধু কবরের ধারণাই আসে। প্রকাশ্যত যাহা একটি সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার গহ্বর। অজ্ঞ লোকেরা ইহাকেই কবর বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা আলমে বরযখের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত আছে, তাহারা জানে যে, ইহা প্রকৃত কবর নহে। ইহা তো শুধু দেহের কবর বা ঘর। রূহের বাসস্থান এই গর্ত নহে; এই গর্তের সহিত রূহের সম্পর্ক থাকিলেও রূহ্ এখানে আবদ্ধ থাকে না। সম্পর্ক থাকা এক কথা আর আবদ্ধ থাকা অন্য কথা।

দেখুন! যমীনের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক অবশ্যই আছে। ইহারই আলোতে সমস্ত ভূমণ্ডল আলোকিত হয়। তাই বলিয়া কি সূর্য যমীনে আবদ্ধ? কখনই নহে, সূর্য যমীন অপেক্ষা শত শত গুণে বড়। রূহকেও তদ্রূপই মনে করুন। কবি বলেনঃ

كَالشَّمْسِ فِىْ كَبِدِ السَّمَاءِ وَضُوْءُهَا ـ يُغْشِى الْبِلَادَ مَشَارِقًا وَّمَغَارِبًا

"যেমন সূর্য আস্‌মানের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং উহার কিরণ পৃথিবীর সকল প্রান্তের নগর ও দেশসমূহকে আলোকিত করে।"

আপনি হয়তো দেখিয়াছেন, কোন পানিপূর্ণ পাত্রে বা ভাণ্ডে দৃষ্টি করিলে সূর্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, সূর্য উহাতে আবদ্ধ আছে? কখনই নহে। এইরূপে আপনারা আয়নার মধ্যে নিজের আকৃতি দেখিতে পান। তখন আয়নার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তো স্থাপিত হয়, কিন্তু তাহাতে আপনি কি আয়নার মধ্যে আবদ্ধ হইলেন? কখনই না। অতএব, মৃত্যুর পরে দেহের সহিত রূহের সম্পর্ক ঠিক এইরূপই থাকে।

সুতরাং এই বাহ্যিক কবর দেহের জন্য অবশ্যই কয়েদখানা। কিন্তু ইহা রূহের বন্দীখানা নহে। বস্তুত রূহই মানুষ, দেহ মানুষ নহে। কোন মানুষকে যদি কবরে দাফন করা না হয়; বরং দেহটাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলে, তখন আপনি বলিতে পারেন না যে, নেকড়ে বাঘ মানুষ খাইয়াছে। এতটুকু বলিতে পারেন যে, দেহকে খাইয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং কবরকে মানুষের বন্দিশালা মনে করা ভুল। উহা শুধু দেহের কারাগার। মন্দ কার্যের দরুন মানুষের কবরে যে সঙ্কীর্ণতা হইয়া থাকে, উহার অর্থ এই নহে যে, কবরের গর্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। কারণ, কেহ কবরে সমাহিত না হইলে কি সে এই সঙ্কীর্ণতা হইতে রক্ষা পাইবে? বরং উক্ত সঙ্কীর্ণতা অন্য রূপ। খুব বুঝিয়া লউন যে, রূহ্ কবরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তবে কবরের সহিত উহার সম্পর্ক অবশ্যই থাকে। যাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাহারা মনে করে যে, মৃত্যুর পরে যে আলমে আখেরাত আরম্ভ হয় তাহা খুবই সঙ্কীর্ণ। ইহার কারণ এই যে, তাহারা এই বাহ্যিক কবরকেই রূহের কবর বলিয়া মনে করে।

**আখেরাতকে ভয় করার কারণঃ** আখেরাত সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তাহারা রূহকে কবরে আবদ্ধ মনে করে না। তাহারা কেবল মনে করে, আখেরাতের জগত আফ্রিকার মরুভূমির ন্যায় বিজন ও ভয়ঙ্কর প্রান্তর। তাহারা কল্পনাও করে না যে, পরলোকে ইহলোকের চেয়ে উৎকৃষ্ট ফল-মূলাদি, সুন্দর ও মনোরম উদ্যানরাজি, বিরাট ও উত্তম অট্টালিকাসমূহ এবং সর্ববিধ সুখ-শান্তির উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কারণেই সাধারণ মানুষের পরলোকের প্রতি আগ্রহ নাই; বরং তাহা হইতে ভয় পাইতেছে। ইহা আখেরাতের নেয়ামতসমূহ হইতে অজ্ঞ থাকারই কুফল। কেননা, সুখ-শান্তির প্রতিই সাধারণত মানুষের আগ্রহ হইয়া থাকে। এমন স্বভাবসম্পন্ন মানুষ অনেক কম আছে—যাহারা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশ্যে আখেরাতের প্রতি আগ্রহশীল হইয়া থাকে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে আখেরাতের নানাবিধ সুখ-শান্তি এবং নেয়ামতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেনঃ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ "ইহার প্রতিই আগ্রহশীল ব্যক্তিদের আগ্রহান্বিত হওয়া উচিত।" অন্যদিকে কোরআন ও হাদীসের বাণীসমূহে আখেরাতের প্রতি উৎসাহ এবং দুনিয়ার প্রতি নিরুৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেনঃ

اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّادَارَ لَهٗ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّاعَقْلَ لَهٗ

"দুনিয়া তাহার ঘর যাহার ঘর নাই এবং দুনিয়ার জন্য সঞ্চয় করে সেই ব্যক্তি, যাহার বুদ্ধি নাই।" অথচ আমাদের অবস্থা ইহার বিপরীত। দুনিয়ার প্রতিই আমাদের আগ্রহ অধিক, আর আখেরাতকে আমরা ভয় করি। ইহার একমাত্র কারণ আখেরাতের নেয়ামতসমূহ হইতে অজ্ঞতা। এখনই আমি তাহা বর্ণনা করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, কারণ দূরীভূত করিয়াই ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে। সুতরাং আখেরাতের নেয়ামত এবং সুখ-শান্তির কল্পনা সর্বদা মনের সম্মুখে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। এই কারণেই অদ্যকার আলোচনার জন্য আমি এই আয়াতটি অবলম্বন করিয়াছি।

শুনুন! আল্লাহ্ বলেনঃ اَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا "যাহারা নেক্‌কার তাহারা বেহেশ্‌তের মধ্যে চিরকাল থাকিবে।" বেহেশ্‌ত-এর আভিধানিক অর্থ উদ্যান। সোব্‌হানাল্লাহ্! কি পবিত্র বাণী! একটি শব্দের মধ্যেই সমস্ত বিবরণ দান করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইতিপূর্বে বলিয়াছেন, اَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ "দুরদৃষ্ট লোকেরা দোযখে প্রবেশ করিবে।" এখানেও একটিমাত্র শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে আবশ্যকীয় ব্যাখ্যা নাই।

ইহাতে তালেবে-এল্‌মগণের অনুধাবনের উপযোগী একটি রহস্য নিহিত আছে। তাহা এই যে, ভয় জিনিসটি মূলত কাম্য নহে; বরং উহা শুধু পাপ কার্য হইতে রক্ষিত থাকার উপায় হিসাবে কাম্য। এই বর্ণনাপদ্ধতি দ্বারা আমাদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে যে, ভয় প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। কেননা, অধিক ভয় প্রদর্শনে মানুষ ঘাবড়াইয়া যায়। কোন কোন সময় আল্লাহ্‌র রহ্‌মত হইতে নিরাশ হইয়া পড়ে। ফলে সে আমল ছাড়িয়া দেয়।

কানপুর শহরে আমার নামীয় এক উকিল সাহেব এমন অবস্থায় আমার নিকট আসিলেন যে, তাঁহার চেহারায় নিরাশার ছায়া প্রতিফলিত ছিল। তিনি 'এহ্‌ইয়াউল উলুম' কিতাবের 'বাবুল-খাওফ' অধ্যয়ন করিয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলাম এবং 'এহ্‌ইয়াউল উলুম' কিতাবের 'বাবুল-খাওফ' পড়িতে নিষেধ করিয়া দিলাম। অতএব, বেশী ভয় প্রদর্শনের অনুমতি নাই। হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছেঃ

وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُوْلُ بِهٖ بَيْنِىْ وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ

ইহাতে বুঝা গেল, শুধু এতটুকু ভয় কাম্য যাহা পাপ কার্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারে। ইহার অধিক কাম্য নহে যাহাতে নিরাশার উদ্ভব হইতে পারে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এস্থলে শুধু نار "অগ্নি" শব্দ বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কারণ, نار শব্দটিতে অন্য কোন প্রকারের শাস্তি বুঝাইতেছে না। অতএব, অন্য কোন শাস্তির প্রতি ইঙ্গিতও করা হয় নাই। পক্ষান্তরে আশান্বিত এবং উৎসাহিত করা মূলত কাম্য। এই কারণে বিপরীতপক্ষে নেক্‌কারদিগকে বেহেশ্‌তের বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের আবশ্যক ছিল, যেন আখেরাতের প্রতি আগ্রহ এবং উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

**আখেরাতের নেয়ামত সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলঃ** কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এতই মার্জিত ও অর্থপূর্ণ যে, নেক্‌কারদের পরিণাম সম্বন্ধেও একটিমাত্র শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন الْجَنَّة। (উদ্যান); কিন্তু ইহা এমন একটি শব্দ, স্বভাবতই মন ইহার বিস্তৃত বিবরণের প্রতি ধাবিত হয়। কেননা, উদ্যানে নানাবিধ সুস্বাদু ফল-মূলাদি থাকে, ছায়া থাকে, গাছে গাছে বিভিন্ন ফুল শোভা পায়। আনন্দদায়ক স্নিগ্ধ সমীরণও থাকে, প্রচুর পরিমাণে পানিও থাকে। ইহার সঙ্গে আর একটি কথা যোগ করিয়া চিন্তা কর যে, উহা খোদার উদ্যান। এখন বুঝিতে পারিবে, উহা সাধারণ বাগানবাড়ী নহে। দুনিয়াতেও বাদশাহ্ এবং আমীর লোকের যেসব বাগানবাড়ী আছে, তাহাতে সর্বপ্রকারের শান্তি ও আরামের উপকরণ প্রস্তুত থাকে। নানা রকমের বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক বস্তু সঞ্চিত থাকে। কোন কোন বাদশাহের বাগানে অট্টালিকা প্রভৃতি ব্যতীত জাদুঘর বা চিড়িয়াখানাও থাকে। কাহার কাহারও বাগানে অনুপম ভ্রমণক্ষেত্রও থাকে। অতএব, এখন চিন্তা করিয়া দেখ, খোদার বাগান কেমন বাগান হইবে। বিশেষত আল্লাহ্ তা'আলা যখন উহার প্রতি উৎসাহিতও করিতেছেন, কাজেই উহা কোন সাধারণ বাগান নিশ্চয়ই নহে; বরং উহাতে বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক সাজ-সরঞ্জামও থাকিবে।

সারকথা এই যে, নেক্‌কারদিগকে এরূপ মনে করিও না যে, মৃত্যুর পরে তাঁহাদের সবকিছুই বিলীন হইয়া গেল; বরং তাঁহারা সর্বপ্রকারের আরামে ও শান্তিতে থাকিবেন। কাফের এবং মোনাফেকদের এরূপ ধারণা ছিল যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু পূর্বকালের মুসলমানদের ধারণা এরূপ ছিল না; অবস্থাও তদ্রূপ ছিল না। আজকালকার মুসলমানদের ধারণা যদিও এরূপ শুনা যায় নাই, কিন্তু তাহাদের অবস্থা হইতে কতকটা এরূপই বুঝা যায় যে,

তাহারাও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু শেষ এবং বিলীন হইয়া যায় বলিয়া ধারণা করিতেছে। কেননা, ধারণা এরূপ না হইলে উহার কিছু না কিছু লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পাইত। বেহেশ্‌তের প্রতি আগ্রহ অবশ্যই হইত, আখেরাতের প্রতি বিরাগ এবং ভয় থাকিত না। মোনাফেকদের অবস্থা এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ
اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ج لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط

অর্থাৎ, তাহাদের ভাই-বন্ধুদের মৃত্যুতে তাহারা শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে, আহা! তাহারা আমাদের নিকট থাকিলে নিহত হইত না, যুদ্ধে চলিয়া যাওয়াতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কাফের ও মোনাফেকদের এরূপ অবস্থা এই কারণে হইয়াছে যে, তাহারা দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করিত। আখেরাত সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এই কারণেই মুসলমান যুদ্ধে শহীদ হইলে তাহারা তাঁহাদের সবকিছু বিফল হইয়াছে মনে করিত। তাহাদের দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন, যেমন পাথরের অভ্যন্তরস্থ কোন কীট মনে করে, তাহার আসমান-যমীন সবকিছু এই পাথরের মধ্যেই।

چوں آں کرمے که در سنگے نہاں ست - زمیں وآسماں وے ہماں ست

তাহাদের দৃষ্টান্ত 'মস্‌নবী' কিতাবে বর্ণিত সেই যাযাবরের ন্যায়ও মনে করিতে পারেন। উক্ত বদ্দু লোকটি রিক্তহস্ত ও অনাহারী ছিল। তাহার স্ত্রী বলিলঃ শুনা যায়, বাগদাদের খলীফা বড়ই দয়ালু এবং দাতা। তুমি তাঁহার দরবারে কেন যাও না? সম্ভবত তাঁহার এক দয়া দৃষ্টিতেই আমাদের অভাব মোচন হইয়া যাইতে পারে। স্বামী বলিলঃ ভাল পরামর্শ দিয়াছ, কিন্তু বাদশাহের দরবারের উপযোগী কিছু হাদিয়া লইয়া যাওয়া আবশ্যক। স্ত্রী বলিল, ইদানীং কয়েক বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টির ফলে সর্বত্র পানির অভাব, কিন্তু আমাদের পুষ্করিণীতে কিছু পানি আছে। ইহাই দুর্লভ বস্তু হইবে। ইহার চেয়ে অধিক উপযোগী আর কোন্ বস্তু বাদশাহের জন্য হাদিয়া নেওয়া যাইতে পারে? যাযাবর লোকটি বলিলঃ ঠিক বলিয়াছ, ইহার চেয়ে উত্তম আর কোন হাদিয়াই হইতে পারে না। হয়তো এমন পানি বাদশাহের ভাগ্যে কখনও জোটে নাই।

পরিশেষে সে পুষ্করিণী হইতে এক কলসী পানি লইয়া বাগদাদ যাত্রা করিল। সারা পথে رَبِّ سَلِّمْ - رَبِّ سَلِّمْ ওযীফা পড়িতে পড়িতে যাইতে লাগিল, যেন আল্লাহ্ তা'আলা পানির কলসীটি নিরাপদে বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। খলীফার মহলে পৌঁছিয়া সে রক্ষী ও প্রহরীদের বলিল, আমি খলীফার জন্য একটি দুর্লভ হাদিয়া লইয়া আসিয়াছি, তাঁহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক। প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ খলীফাকে সংবাদ দিলে তিনি তাহাকে হাযির করিতে নির্দেশ দিলেন। লোকটি পানির কলসী মাথায় করিয়া দরবারে পৌঁছিলে খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন, يَا وَجْهَ الْعَرَبِ مَاعِنْدَكُمْ "হে সম্মানিত আরব! কি হাদিয়া আনিয়াছ?" ইহা শুনিতেই লোকটি পানির কলসীটি সিংহাসনের উপর রাখিয়া বলিলঃ هٰذَا مَاءُ الْجَنَّةِ "ইহা বেহেশ্‌তের পানি।"

খলীফা কলসীর মুখ খুলিতেই বদ্ধ পানির দুর্গন্ধে সমস্ত দরবার ভরিয়া গেল। কেননা, কয়েকদিন ধরিয়া কলসীর মুখ বন্ধ থাকার কারণে গরমে পানি দুর্গন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সোবহানাল্লাহ্! খলীফার এমন সদাশয়তা এবং বদান্যতা! চেহারায় একটুও অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। দরবারিগণের কি সাধ্য ছিল একটু অসন্তোষ প্রকাশ করে? খলীফা যাযাবর

লোকটির খুব শোক্‌রিয়া আদায় করিয়া বলিলেনঃ বাস্তবিকই তুমি আমার জন্য বড় দুর্লভ হাদিয়া আনিয়াছ, ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন হাদিয়াই হইতে পারে না। অতঃপর তাহাকে অতিথিশালায় প্রেরণ করা হইল। কয়েকদিন তাহাকে মেহ্‌মান রাখিয়া মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া দেওয়া হইল। তৎপর তাহার কলসীটি স্বর্ণ-মুদ্রায় পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে বিদায় দিতে নির্দেশ দিলেন। আর প্রত্যাবর্তনকালে দজ্‌লা নদীর ধার দিয়া বাহির করিতে বলিয়া দিলেন। যেন সে নিজ চক্ষে দেখিয়া যাইতে পারে যে, খলীফা এই হাদিয়ার মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাঁহার মহলের তলদেশ দিয়া এমন মিষ্ট পানির নহর বহিয়া যাইতেছে।

رو برو سلطاں وکار وبار بیں - حسن تجری تحتها الانهار بیں

"বাদশাহের সুন্দর কার্যকলাপ দর্শন কর। মহলের নিম্নদেশে প্রবাহমান নহরসমূহের শোভা দর্শন কর।" বদ্দু লোকটি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলসী লইয়া যখন দজ্‌লা নদীর তীরে পৌঁছিল, তখন লজ্জায় তাহার মাটির নীচে লুকাইবার ইচ্ছা হইতেছিল। সে বলিয়া উঠিলঃ আল্লাহু আকবর! খলীফা আমার হাদিয়ার যে মর্যাদা দান করিয়াছেন, তাহা শুধু তাঁহার মহানুভবতা মাত্র। আমার এই হাদিয়ার বিনিময়ে তিনি আমাকে যে পোশাক ও পুরস্কার দান করিয়াছেন, তাহা সম্বন্ধে শুধু এই বলা যাইতে পারেঃ أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ "আল্লাহ্ তাহাদের মন্দ কার্যসমূহকে নেক কার্যে পরিবর্তিত করিয়া দিবেন।"

বন্ধুগণ! এই ব্যক্তি যেমন দজ্‌লা নদী দর্শন করিয়া নিজ পুকুরের পানিকে হাদিয়া আখ্যা দিতে লজ্জাবোধ করিয়াছিল, আল্লাহ্‌র কসম! এইরূপে আমরা আখেরাতের নেয়ামতসমূহ স্বচক্ষে দেখিলে দুনিয়ার স্বাদ ও সুখ-শান্তিকে স্বাদ বলিতে লজ্জাবোধ করিব। কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এই কারণেই আমরা যখন এখানে আম কিংবা খরবুযা খাই, তখন আমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে করি—'আহা আজ সে থাকিলে সেও খাইতে পারিত।' আল্লাহ্‌র কসম, সে তো এখন তোমাদের এখানকার খরবুযা খাওয়া দূরের কথা, এদিকে ফিরিয়াও তাকাইবে না।

**দানকৃত বস্তুর সওয়াব মৃত ব্যক্তিরা পাইয়া থাকেঃ** কেহ কেহ প্রত্যেক মওসুমে মওসুমী উৎপন্ন দ্রব্য হইতে নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য দান-খয়রাত করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া যে সমস্ত দ্রব্য মৃত ব্যক্তি ভালবাসিত। অনেক আলেম লোকও এরূপ কাজে লিপ্ত আছেন। তাঁহারা বরং এবিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা একাজের জন্য দলিল পেশ করেনঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

"তোমরা পূর্ণ সওয়াব লাভ করিতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান কর।" অর্থাৎ, প্রিয় বস্তু দান করাই শরীঅতের কাম্য। সুতরাং মৃত ব্যক্তির প্রিয় বস্তু তাহার নামে দান করাতে ক্ষতি কি? আমি বলি, আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ "তোমাদের প্রিয় বস্তু হইতে", কিন্তু "তাহাদের প্রিয় বস্তু হইতে" বলেন নাই; সুতরাং দাতার উচিত নিজের প্রিয় বস্তু দান করা, মৃত ব্যক্তির প্রিয় বস্তু নহে। ইহাতে রহস্য এই যে, এখ্‌লাছেই দানের ফযীলত বৃদ্ধি পায়, আর নিজের প্রিয় বস্তু দান করাতেই এখ্‌লাছ অধিক হইয়া থাকে, অপরের প্রিয় বস্তু দান করাতে নহে, ইহা তো ছিল উক্ত আলেমদের দলিলের জবাব।

এখন আমি দলিল দ্বারা প্রমাণ করিব, আমরা যাহাকিছু মুরদার উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকি, অবিকল তাহাই মুরদার নিকট পৌঁছে না ; বরং উহার সওয়াব পৌঁছিয়া থাকে। শুনুন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَادِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

(তোমরা যে জন্তু আল্লাহ্র নামে কোরবানী কর) "উহাদের মাংসও আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে না এবং উহাদের রক্তও না। কিন্তু তোমাদের খোদাভীতি তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া থাকে।" ইহাতে পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে যে, কোরবানীর জন্তুর মাংস এবং রক্ত আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছে না ; বরং তোমাদের খাঁটি নিয়ত ও এখ্লাছ পৌঁছিয়া থাকে, আর ইহারই সওয়াব তোমরা লাভ কর এবং সে সওয়াবই মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়—যদি তাহাদের পক্ষ হইতে কোন কোরবানী বা কোন কিছু দান করা হয়। ইহাতে আপনারা একথাও জানিতে পারিয়াছেন যে, মহররম মাসের শরবত বিতরণেও সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, কারবালার শহীদগণ পিপাসার্ত অবস্থায় শহীদ হইয়াছেন ; সুতরাং তাহাদের রূহ্কে শরবত পৌঁছান উচিত, যেন তাঁহাদের পিপাসা নিবারণ হয়। অতএব, প্রথমত এই ধারণাই ভুল যে, এই শরবতই তাঁহাদের নিকট পৌঁছিয়া থাকে ; এই শরবত কখনও পৌঁছে না। দ্বিতীয়ত এরূপ রীতি আকীদারও বিপরীত। আপনারা কি এই আকীদা পোষণ করেন যে, শহীদানে কারবালা এখন পর্যন্ত পিপাসার্তই রহিয়া গিয়াছেন ? তাঁহারা এখনও কি বেহেশ্তের শরবত প্রাপ্ত হন নাই ? এরূপ আকীদা একান্তই অশোভন। আমাদের আকীদা এই যে, শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, আল্লাহ্র ফযলে তাঁহারা বেহেশ্তের সেই শরাবে তহুরের পেয়ালা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের পূর্ববর্তী পিপাসাও নিবৃত্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতকালের জন্যও পিপাসা নিবৃত্ত হইয়াছে।

এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের এক অনিষ্টকারিতা এই যে, কোন কোন বৎসর শীতকালে মহররম মাসের আগমন হয়। তখনও শরবত পান করান হয়। ইহার কুফল এই দাঁড়ায় যে, অনেক লোক অসুস্থ হইয়া পড়ে। কেহবা নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। এমন রীতি পালন হইতে খোদা রক্ষা করুন। গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, লোকে না বুঝিয়াই এসমস্ত নিয়ম-প্রথা পালন করিয়া থাকে।

যেমন, বিবাহের দুই-চারদিন পূর্বে দুল্হানকে হলুদ বা অন্য কোন রং-এর কাপড় পরাইয়া বদ্ধ কোঠায় নির্জনে বসাইয়া রাখা জরুরী মনে করা হয়। সেখানে তাহাকে নীরবতা এবং উপবাস শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে বিবাহের পরে মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং নীরব থাকা তাহার পক্ষে কঠিন না হয়। কিন্তু আমি বলি, বিয়ের পরক্ষণেই এই নীরব থাকার আবশ্যকতাই বা কি ? রসম বা কুসংস্কার পালন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোন কোন সময় গ্রীষ্মকালে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই কুসংস্কার পালন করার ফল এই দাঁড়ায় যে, দুল্হানকে বদ্ধ কোঠায় আবদ্ধ রাখিলে তাহার মস্তিষ্ক গরম হইয়া যায়। এখন মেয়েলোকেরা বলিবে না যে, বদ্ধ কোঠায় আবদ্ধ করার ফলেই মাথা গরম হইয়াছে ; বরং বলিবে যে, জিন্ বা ভূতের আসর হইয়াছে। আমি বলি, আসর হইয়াছে সত্য ; কিন্তু বলিতে পার কি, এই ভূত কে ? দুল্হানের মা, যিনি বেচারীকে দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে বদ্ধ কোঠায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কেননা, শয়তান দুই প্রকার—জিন্ জাতীয় শয়তান এবং মানুষ জাতীয় শয়তান। বস্তুত মেয়েদের নিকট ভূতের আসর খুবই সস্তা, কথায় কথায় ভূতের আসর হইয়া যায়।

ইহার ফল এই হয় যে, প্রথমে তো বদ্ধ কোঠায় গরম মাথায় উঠার কারণে মেয়ে প্রলাপ বকিয়াছিল। যখন তোমরা ইহাকে ভূতের আসর বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছ এবং উহার তদবীরও করিয়াছ। এইরূপ পরিস্থিতির শিকার মেয়েরা কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাকে বাহানাস্বরূপ কাজে লাগায় এবং প্রত্যেক ব্যাপারে নিজের উপর ভূতের আসর সওয়ার করিয়া লয়। যেমন, কোন কোন ক্ষেত্রে শুনা গিয়াছে, স্ত্রী কোন ব্যাপারে স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার উপর 'এলাহী বখ্‌শ্‌ মামুর' আসর হইয়াছে বলিয়া বাহানা জুড়িয়া দেয়। স্বামী নির্বোধ হইলে স্ত্রীর ধোঁকায় পতিত হয় এবং চতুর হইলে জুতার সাহায্যে উহার চিকিৎসা আরম্ভ করে। মাথার উপর দশ-বারটা জুতার আঘাত পড়িতেই সমস্ত 'আসর' পলায়ন করে।

বিবাহের পূর্বে বদ্ধ কোঠায় আবদ্ধ করার প্রথায় যেমন শীত-গ্রীষ্মের বিচার করা হয় না, তদ্রূপ মহর্‌রমের শরবত পান করাইবার প্রথায়ও শীত-গ্রীষ্মের ভেদ-বিচার করা হয় না। অতএব, আমি মনে করি, শরবত বিতরণকারীদের ধারণা—যে বস্তু দান করা হয়, ঠিক তাহাই মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়া থাকে। এই ধারণা ভুল। মৃত ব্যক্তির প্রিয় বস্তু তাহার উদ্দেশ্যে ব্যয় করার মূলেও এই আক্ষেপ যে, আহা! আজ সে জীবিত থাকিলে সেও তো খাইত। সে যখন নাই, তবে তাহার জন্য দান করিয়াই দেওয়া হউক। যেন তাহার নিকট পৌঁছিয়া যায়। ইহার একমাত্র কারণ, আখেরাতের নেয়ামতসমূহের কথা আমরা স্মরণ রাখি না। যদি আমাদের মনে থাকিত পরলোকে বেহেশ্‌তের বহুবিধ নেয়ামত ভোগ করিয়া সে আনন্দিত রহিয়াছে, তবে তাহার জন্য এরূপ আক্ষেপ কখনও হইত না। কেননা, বেহেশ্‌তের নেয়ামতসমূহের সহিত দুনিয়ার নেয়ামতের কোনই সম্পর্ক নাই।

ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে বেহেশ্‌তের যে সমস্ত আপেল এবং খোরমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহাদিগকে দুনিয়ার আপেল এবং খোরমার উপর যেন ক্বেয়াস বা অনুমান করা না হয়। আখেরাতের নেয়ামতের সহিত দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের শুধু নামে মাত্র সাদৃশ্য থাকিবে। অন্যথায় বেহেশ্‌তের নেয়ামত এক বস্তু আর দুনিয়ার নেয়ামত অপর বস্তু। নামে মাত্র উভয়ের মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য থাকিবে। যেমন, মাহমুদাবাদের রাজা বড় লাটকে নিমন্ত্রণ করিয়া দুই শত টাকা ব্যয়ে এক আনার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। উহা নামে এবং আকারে অবশ্য আনারের মতই ছিল, কিন্তু মূলে তাহা অন্য বস্তু ছিল। কোরআনে উল্লেখ আছেঃ قَوَارِيْرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا অর্থাৎ, বেহেশ্‌তে চাঁদির বা রৌপ্যের কাঁচ হইবে। উহাতে আয়নার ন্যায় স্বচ্ছতা থাকিবে। কিন্তু মূলত তাহা রৌপ্য। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, বেহেশ্‌তের পদার্থসমূহ নামে মাত্র দুনিয়ার পদার্থসমূহের সদৃশ হইবে, অন্যথায় তথাকার রৌপ্য আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইবে, যাহাতে এদিক হইতে দৃষ্টি করিলে অপর পৃষ্ঠে দেখা যাইবে। দুনিয়ার রৌপ্যে এই স্বচ্ছতা কোথায়? এখনও তুমি এই আকাঙ্ক্ষা করিতেছ—আহা! যদি মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকিত এবং তাহার প্রিয় খাদ্য খাইতে পারিত। অথচ মৃত ব্যক্তি সেখানে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, আহা! যদি তোমরা মরিতে এবং তাহার ন্যায় বেহেশ্‌তের নেয়ামত ভোগ করিতে পারিতে!! খোদা জানেন এখানে এমন কি আছে যাহার জন্য মানুষ এত পাগলঃ

زر و نقره چیست تا مفتوں شوی - چیست صورت تا چنیں مجنوں شوی

"সোনা-চাঁদি এমন কি পদার্থ? যাহার জন্য তুমি এত মত্ত। কি উহার আকৃতি, যার জন্য তুমি এত পাগল?"

**দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামতসমূহের সাদৃশ্য ঃ** আখেরাতের নেয়ামতসমূহের বিবরণ হাদীসের বর্ণনা হইতে অবগত হউন। হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে—"হূরগণের মাথার উপর এমন উৎকৃষ্ট ও সুন্দর ওড়নাসমূহ রহিয়াছে যে, উহার এক পার্শ্ব দুনিয়ার আসমান হইতে ঝুলাইয়া দিলে চাঁদ-সুরুজের আলো নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। বেহেশ্‌তের হূরগণের রূপ এত উজ্জ্বল যে, সত্তর পরত কাপড়ের নীচে হইতেও তাহাদের দেহ ঝলসিতে থাকিবে। বেহেশ্‌তের মাটি মূল্যবান জওহর এবং মেশ্‌ক। হাউযে কাউসারের পানির বিবরণ এই— مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَّايَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا "যে ব্যক্তি উহা হইতে একবার পানি পান করিবে আর কখনও তাহার পিপাসা হইবে না।" মজার ব্যাপার এই যে, পিপাসা ব্যতীতও উহার পানি পান করিবার আগ্রহ হইবে, পূর্ণ স্বাদ প্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার পানিতে পিপাসার সময় তো স্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু পিপাসা ব্যতীত ইহাতে কোনই স্বাদ পাওয়া যায় না। বেহেশ্‌তের পানির এই গুণ—একবার পান করিলে সারা জীবনের তরে পিপাসার কষ্ট নিবারণ হইয়া যাইবে। পিপাসা ব্যতীতও উহার স্বাদ যথারীতি পাওয়া যাইবে। বলুন, দুনিয়ায় এমন পানি কোথায়? যাহা পান করিলে আর কখনও পিপাসাই হয় না, আবার পিপাসা ব্যতীতও স্বাদ পাওয়া যায়। ইহার উপরই অন্যান্য সমস্ত নেয়ামতের অবস্থা অনুমান করিয়া লউন। বেহেশ্‌তের নেয়ামতসমূহের সহিত দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের শুধু নামে মাত্র সামঞ্জস্য এবং সাদৃশ্য আছে।

কাজেই এরূপ আক্ষেপ করা—"আমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন যদি দুনিয়ায় থাকিত এবং এখানের নেয়ামতসমূহ ভোগ করিতে পারিত" নিছক বোকামি ছাড়া আর কি বলা যায়। এসমস্ত নেয়ামত তাহাদের সম্মুখে রাখিলে তাহাদের বমি আসিবে। গঙ্গোহ শহরে আমি এই বিষয়টি অবলম্বনে এক দরবেশের সংশোধন করিয়াছিলাম। তিনি হযরত হাজী ছাহেব কেবলার মুরীদ ছিলেন। কিন্তু সঙ্গীত শ্রবণ এবং ওরস্‌ অনুষ্ঠানের বেদআত প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তিনি গঙ্গোহ শহরে আসিয়া হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুসের (রঃ) মাযারে ফুল ছিটাইয়া আমার নিকট আসিলেন এবং আমার গলায়ও ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, এক বাগানে গিয়াছিলাম। তথা হইতে এই ফুলগুলি আনিয়া কিছু অংশ হযরত শায়খের মাযারে ছিটাইয়া অবশিষ্ট অংশ আপনার জন্য আনিয়াছি। কেননা, আপনিও আমার নিকট শায়খের ন্যায় প্রিয়। আমি বলিলাম, আপনি শায়খের মাযারে ফুল ছিটাইয়া বড় ভুল করিয়াছেন। কেননা, অবস্থা দুইয়ের বাহিরে নহে—হয়তো শায়খের রূহ অনুভব করিতে পারিয়াছেন অথবা পারেন নাই। যদি অনুভব করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে এই ফুল ছিটাইবার সার্থকতা কি? আর যদি অনুভব করিয়া থাকেন, তবে বলুন, যিনি বেহেশ্‌তের আতর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য উপভোগ করিতেছেন, এই ফুলের ঘ্রাণে তাঁহার কি শান্তি বা আনন্দ হইতে পারে? বরং তিনি হয়তো ইহাতে অশান্তি এবং কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি সতর্ক হইয়া গেলেন, নিজের ভুল স্বীকার করিলেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ করিবেন না বলিয়া তওবা করিলেন।

আপনারা শুধু এই নিয়মটি বুঝিয়া লউন, বেহেশ্‌তের নেয়ামতের সম্মুখে দুনিয়ার নেয়ামত কিছুই নহে। অতঃপর মওসুমের নেয়ামত উপভোগ করার সময় মৃত ব্যক্তির জন্য আপনাদের কোন আফ্‌সোস বা আক্ষেপ হইবে না যে, আহা! আমার অমুক আত্মীয় জীবিত থাকিলে সেও খাইতে পারিত। এখন সে বঞ্চিত। বন্ধুগণ! বেহেশ্‌তের নেয়ামতের সহিত দুনিয়ার নেয়ামতের কোন তুলনাই চলে না।

আরও একটি পার্থক্য আছে—ইহলোকের সর্ববিধ নেয়ামত সামান্য কিছুক্ষণ পরেই পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয় কিংবা পেটে যাইয়া দুর্গন্ধময় পায়খানায় পরিণত হয়। ইহার দুর্গন্ধে মস্তিষ্ক অস্থির হইয়া উঠে। বেহেশ্‌তের নেয়ামতে অতিরিক্ত অংশ কিছুই নাই। যত ইচ্ছা খাও। একটি সুগন্ধময় ঢেকুর আসিবে, আর সমস্ত ভুক্তদ্রব্য হজম হইয়া যাইবে কিংবা সামান্য সুগন্ধময় ঘাম বাহির হইবে এবং সমস্ত পানকৃত পানি হজম হইয়া যাইবে। বেহেশ্‌তে পায়খানা-প্রস্রাব করার প্রয়োজন হইবে না। পেটে অসুখ করার সম্ভাবনাও নাই। তথাকার সুখ-শান্তির মধ্যে কষ্টের নাম পর্যন্ত নাই। এই কারণে কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, আদম আলাইহিস্ সালামকে যে বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল—তাহা দুনিয়ার বৃক্ষ ছিল। তাঁহার পরীক্ষার জন্য বেহেশ্‌তে উক্ত গাছ লাগান হইয়াছিল। তাঁহাকে উক্ত বৃক্ষের ফল খাইতে এই কারণে নিষেধ করা হইয়াছিল যে, উহা ভক্ষণে পেটে মল উৎপন্ন হইবে, অথচ বেহেশ্‌তে মল ত্যাগের স্থান নাই। আদম (আঃ) উক্ত বৃক্ষের ফল খাইতেই তাঁহার মল ত্যাগের প্রয়োজন হইল। তৎক্ষণাৎ নির্দেশ হইল, বেহেশ্‌ত হইতে বাহির হও, দুনিয়ায় যাও। মল ত্যাগের স্থান সেখানে। বেহেশ্‌তে সেই ব্যবস্থা নাই।

অতএব, শুধু মল ত্যাগের প্রয়োজনে তাঁহাকে পৃথিবীতে আসিতে হইয়াছিল। নিছক শাস্তির জন্য নহে। বস্তুত সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দাগণের প্রতি কি কখনও নিছক শাস্তি বা তিরস্কার হইয়া থাকে?

বেহেশ্‌তের খাদ্যসমূহে পেটে মল উৎপন্ন না হওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে এই সূক্ষ্ম কথাটি ব্যক্ত করা হইল। আমি বলিতেছিলাম, ইহা একান্ত সত্য কথা যে, বেহেশ্‌তের খাদ্যে অতিরিক্ত অংশ অর্থাৎ, মল-মূত্রের ভাগ মোটেই নাই। সুতরাং আমাদের অমুক মৃত আত্মীয় দুনিয়ার অমুক নেয়ামত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করা একেবারে নিরর্থক। তাহারা বেহেশ্‌তে এমন নেয়ামত খাইতেছে যাহা তোমরা স্বপ্নেও দেখিতে পাও নাই। কিন্তু আমরা বেহেশ্‌তের নেয়ামতসমূহ দেখিও নাই এবং সে সম্বন্ধে চিন্তাও করি না। এই কারণেই দুনিয়ার নেয়ামতে মত্ত রহিয়াছি এবং এমনভাবে মত্ত হইয়াছি যে, এই জগতের পচা বস্তুসমূহও বেহেশ্‌তে কামনা করিতেছি। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব রাহেমাহুল্লাহুর এক খাদেম হুক্কাপানে অভ্যস্ত ছিল। সে মাওলানার নিকট জিজ্ঞাসা করিলঃ হযরত! বেহেশ্‌তে তামাক সেবনের নিমিত্ত আগুন পাওয়া যাইবে কিনা। এই বেচারা হুক্কা-তামাকে এত মত্ত যে, বেহেশ্‌তেও হুক্কা কামনা করিতেছে। এই জ্ঞান রাখে না যে, বেহেশ্‌তের নেয়ামতসমূহ দেখিয়া দুনিয়ার উপভোগ্য সবকিছুই ভুলিয়া যাইবে। হুক্কা-তামাক এমন আর কি বস্তু! ইহা তো একটা বাজে জিনিস। এক কবি সুন্দর বলিয়াছেনঃ

على الصباح كه مردم بكاروبار روند ـ بلاكشان تمباكو بسوى نار روند

“প্রত্যুষে মানুষ যখন কাজকর্মের দিকে যায়, তামাকসেবীগণ তখন আগুণের দিকে যায়।” ভোরের পবিত্র ও মহান সময় অন্যান্য লোকের জন্য এবাদতের সময়। আর তামাকসেবীগণ এমন সময়ে আগুনের তালাশে বাহির হয়। এমন কি, বেহেশ্‌তের ন্যায় পবিত্র স্থানেও তাহাদের এই চিন্তা—আগুন পাওয়া যাইবে কিনা। আমি তামাক সেবন হারাম বলিতেছি না। কিন্তু মূলে ইহা নিকৃষ্ট বস্তু। তামাকসেবীগণ ইহা ব্যতীত পানাহারেও স্বাদ পায় না। মহান এবং পবিত্র সময়েও তাহারা এই চিন্তায়ই মগ্ন থাকে। আবার তামাক সেবনে আকৃতিও বীভৎসাকার ধারণ করে। মুখেও ধোঁয়া, নাকেও ধোঁয়া, পেটেও ধোঁয়া—একেবারে দোযখীদের আকৃতি। বেহেশতিগণের দোযখী লোকের আকৃতি ধারণ করা কেমন কথা?

**বেহেশ্‌তের বিস্ময়কর ফলঃ** আমরা বেহেশ্‌তের নেয়ামত সম্বন্ধে কখনও চিন্তা করিয়া দেখি নাই। এই কারণেই দুনিয়ার নেয়ামতে মত্ত রহিয়াছি। কোন এক কিতাবে দেখিয়াছি, বেহেশ্‌তে বিচিত্র মজার ব্যাপার হইবে—কোন কোন সময় ফল সম্মুখে আনয়ন করা হইবে। খাওয়ার জন্য উহা ভাঙ্গিতেই উহা হইতে অতি সুন্দরী হূর বাহির হইয়া আসিবে। ইহা দেখিয়া বেহেশ্‌তীর বিস্ময়ে তাক লাগিয়া যাইবে।

কোন এক আমীর লোকের মেহমানদারীর কাহিনী শুনিয়াছি। উক্ত আমীর লোকের বাবুর্চি মেহমানের সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া রাখিল। তাহা পরিমাণে খুবই অল্প ছিল। রুটি এবং তরকারী নিঃশেষ হইলে বাবুর্চি বলিল, ডিশ্ এবং পেয়ালা ভক্ষণ করুন। মেহ্‌মান ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলঃ তুমি বেআদবী করিতেছ? আমাকে ডিশ্-পেয়ালা খাইতে বলিতেছ? সে করজোড়ে বলিলঃ হুযূর, বেআদবী করিতেছি না। আপনি ইহা ভাঙ্গিয়াই দেখুন। মেহ্‌মান ডিশ্ ও পেয়ালা ভাঙ্গিয়া দেখিতে পাইলেন, উহা 'মালাই।' আহার করিয়া খুব স্বাদ পাইলেন। বাবুর্চি পুনরায় বলিলঃ দস্তরখানও আহার করুন। দস্তরখান ছিঁড়িয়া মুখে দিতেই মেহমান দেখিতে পাইল, এক বিচিত্র ধরনের রুটি।

নবাব-বাদশাহ্‌দের দস্তরখানে এরূপ মজার ব্যাপার সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। কিন্তু বেহেশ্‌তে এমন তামাশা প্রত্যহ হইবে। অতএব, এরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল যে, মৃত্যুর পরে মানুষের সবকিছুই বিলীন হইয়া যায়। মুসলমান কখনও এরূপ হয় না; বরং মৃত্যুর পরে মুসলমান এমন শান্তি ও আরামজনক স্থানে পৌঁছিয়া যায় যে, উহার সম্মুখে দুনিয়ার সুখ-শান্তি এবং নেয়ামত কিছুই নহে। অতএব, মৃত আত্মীয়েরা পরলোকে গমন করিয়া আকাঙ্ক্ষা করেঃ আহা, তোমরাও যদি সেখানে হইতে, দুনিয়ায় না থাকিতে! আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۙ ○ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

আল্লাহ্‌র দ্বীনের উন্নতির জন্য যাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হইয়াছেন, তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না। তাহারা স্বীয় প্রভুর সন্নিধানে জীবিত। তাহাদিগকে বেহেশ্‌ত হইতে রিযিক প্রদান করা হইতেছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও দয়ায় তাহারা বেশ আনন্দে আছে। যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই, তাহাদের জন্যও তাহারা আনন্দ করে যে, পরলোকে পৌঁছিয়া তাহাদের কোন প্রকার চিন্তা বা ভয় থাকিবে না। তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও পুরস্কার লাভ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে এবং এজন্যও তাহারা আনন্দিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা নেককার লোকের বিনিময় নষ্ট করেন না। এখন বল, তোমাদের অভিমতই ঠিক, না বেহেশ্‌তবাসীদের? নিঃসন্দেহ, তাঁহাদের মতই ঠিক। তাই দুনিয়া ছাড়িয়া পরলোকে চলিয়া যাওয়া তোমাদের জন্যও মঙ্গল।

**আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্টঃ** আল্লাহ্ পাক বলেনঃ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى "তোমরা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দান করিতেছ, অথচ আখেরাত উহা হইতে বহুগুণে উত্তম এবং স্থায়ীও বটে।" ইহাতে বুঝা গেল যে, মৃত ব্যক্তিগণের মতই ঠিক। জীবিত লোকেরই বেহেশ্‌তে পৌঁছিবার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। অতএব, তোমরা

মৃত ব্যক্তিদের চিন্তা ছাড়িয়া নিজেদের চিন্তা কর, তোমরাও তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হও। এই বিষয়টি একজন বদ্দু আরব খুব সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছে।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালের (রাঃ)-এর এন্তেকাল হইলে তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ্ (রাঃ) খুবই শোকাতুর হইয়া পড়িলেন। তখন একজন বদ্দু আরব এইরূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন ঃ

اِصْبِرْ نَكُنْ بِكَ صَابِرِيْنَ فَاِنَّمَا ۔ صَبْرُ الرَّعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ الـرَّأْسِ

"হে ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ), ছবর করুন। আপনাকে দেখিয়া আমরাও ছবর করিব। বস্তুত মনিবের ছবরের পরেই প্রজাগণ ছবর করিতে পারে।"

خَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ اَجْرُكَ بَعْدَهٗ ۔ وَاللّٰهُ خَـيْـرٌ مِّنْكَ لِـلْعَبَّـاسِ

"ছবর কেন করিবে না। অথচ ব্যাপার এই যে, আব্বাস যে তোমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তোমাদেরও ক্ষতি হয় নাই, তাঁহারও ক্ষতি হয় নাই। তাঁহার বিচ্ছেদে তোমরা যে শোক পাইয়াছ, তোমরা উহার সওয়াব প্রাপ্ত হইয়াছ। ইহা তোমাদের জন্য আব্বাসকে পাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর তিনি তোমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খোদাকে পাইয়াছেন, যিনি তাঁহার জন্য তোমাদের চেয়ে উত্তম।" বাস্তবিকই অতি সুন্দর সান্ত্বনা! ইব্‌নে আব্বাস বলেন, উক্ত বদ্দু আরব অপেক্ষা উত্তম সান্ত্বনা আমাকে আর কেহই দিতে পারে নাই।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আখেরাতের কথা আমাদের স্মরণ নাই বলিয়াই আমাদের এত দুঃখ-চিন্তা। যদি আখেরাতের সুখ-শান্তির কথা আমাদের স্মরণ থাকিত, তবে আত্মীয়-স্বজনের ইহলোকের চলাফেরা ও গতিবিধির কথা স্মরণ করিতাম না; বরং আমরাও পরলোকে তাঁহাদের নিকট যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিতাম এবং যাইতে পারিলে সুখী হইতাম। দেখুন, আপনার পুত্র হায়দরাবাদ যাইয়া ষ্টেটের মন্ত্রী হইয়া গেলে আপনি কি আকাঙ্ক্ষা করিবেন যে, সে হায়দরাবাদ না গেলে ভাল হইত; কিংবা এই আকাঙ্ক্ষা করিবেন যে, আপনি সেখানে যাইয়া ছেলের সম্মান ও শান-শওকত নিজ চোখে দেখিতে পারিলে ভাল হইত? নিঃসন্দেহ, আপনি নিজেও হায়দরাবাদ যাওয়ারই আকাঙ্ক্ষা করিবেন। তবে নিজের মৃত আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে এরূপ কামনা কেন করিতেছেন যে, তাহারা এখানে থাকিলে ভাল হইত; এরূপ কেন আকাঙ্ক্ষা করেন না যে, আপনারা পরলোকে যাইয়া তাহাদের সুখ-শান্তি দেখিতে পারিলে ভাল হইত?

আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের সর্বদা এই কামনা থাকে যে, ইহলোক ছাড়িয়া কোনরূপে তাড়াতাড়ি পরলোকে পৌঁছিয়া যান। কেননা, তাঁহারা আখেরাতের সুখ-শান্তির অবস্থা দিব্যচক্ষে দেখিতে পান। জামী (রঃ) বলেন ঃ

دلا تاکے دریں کاخ مجازی ۔ کنی مانند طفلاں خاك بازی
توئی آں دست پرور مرغ گستاخ ۔ که بودت آشیاں بیروں ازیں کاخ
چرا ازاں آشیاں بیگانه گشتی ۔ چو دوناں چغد ایں ویرانه گشتی

"হে মন! আর কতকাল এই কৃত্রিম বাসস্থানে খেলাধুলা করিবে? তুমিই সেই নিজ হস্তে প্রতিপালিত ধৃষ্ট ও অবাধ্য পাখী, তোমার বাসা ছিল এই পৃথিবীর বাহিরে, কেন নিজের প্রকৃত বাসা হইতে নিঃসম্পর্ক হইয়া গেলে? কেন হীনমনা উল্লুর (পেঁচক) ন্যায় এই পোড়োবাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছ?"

মাওলানা বলেনঃ

بشنو از نے چوں حکایت می کند - وز جدائی ها شکایت می کند
کز نیستاں تا مرا ببریده اند - از نفیرم مرد و زن نالیده اند

“বাঁশীর দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ কর, বিচ্ছেদ-কষ্ট বর্ণনা করিয়া বলিতেছে, আমাকে বাঁশের ঝোঁপ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, আমার শোক-সন্তপ্ত সুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলে ক্রন্দন করিতেছে।”

যেহেতু আশেকের ক্রন্দন-সুর শ্রবণ করিলে অপরের হৃদয়েও অনুরাগ উৎপন্ন হয়। এই কারণে বলিতেছেন, আশেকদের ক্রন্দন-সুর এবং তাহাদের উক্তি শ্রবণ কর। বাঁশী বলিতে এস্থলে আল্লাহওয়ালা আশেক লোকদিগকে বুঝান হইয়াছে। এই কবিতায় দুনিয়া হইতে বিরাগ এবং আখেরাতের প্রতি অনুরাগ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, আল্লাহ্‌র আশেকদের সংসর্গ অবলম্বন কর। তাঁহাদের বিচ্ছেদ-কাহিনী শ্রবণ কর। কাহার বিচ্ছেদ?

کز نیستاں تا مرا ببریده اند - از نفیرم مرد و زن نالیده اند
سینہ خواهم شرحه شرحه از فراق - تا بگویم شرح درد اشتیاق

“যখন হইতে বাঁশের ঝোঁপ হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, আমার দুঃখ-পূর্ণ ক্রন্দন-সুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলে ক্রন্দন করিতেছে, বিচ্ছেদের দুঃখে বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হউক, যাহাতে আমি এশ্‌কের ব্যথা বিস্তারিত ব্যক্ত করিতে পারি।” কেন? এই কারণে যে—

هرکسے کو دور ماند از اصل خویش - باز جوید روزگار وصل خویش

“যে ব্যক্তি নিজের মূল বাসস্থান হইতে দূর হইয়া পড়ে, সে আবার মূলের সহিত মিলিত হওয়ার পন্থা অন্বেষণ করে।”

জনাব, সমস্ত সর্বনাশের মূল এই যে, আমরা দুনিয়াকে নিজের আসল বাসস্থান মনে করিয়া রাখিয়াছি। এই কারণে আখেরাতের প্রতি আমাদের আগ্রহ নাই। যদি আখেরাতকে প্রকৃত বাসস্থান মনে করিতাম এবং তথাকার নেয়ামত ও সুখ-শান্তির কথা সর্বদা মনে উদিত থাকিত, তবে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন সেখানে যাওয়াতে আমাদের মনে শোক হইত না; বরং নিজেরা যাইতে না পারার জন্য দুঃখ হইত।

**বেহেশ্‌তে কোন কষ্ট নাইঃ** আখেরাতের শান্তির কথা আর কি বলিব—তথাকার অবস্থা এই যে— وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ ○

“মন যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে, যাহাকিছুর জন্য প্রার্থনা করিবে তাহাও পূর্ণ হইবে।” হাদীস শরীফে আছেঃ কেহ কেহ খেত-কৃষির প্রার্থনা করিবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিবেন, হে বনী আদম! তুমি বড়ই লোভী, বেহেশ্‌তে তোমার খেতি-কৃষির কি প্রয়োজন? সে বলিবেঃ প্রভু! আমার মনে চায়। তৎক্ষণাৎ কৃষি উৎপন্ন হইয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ শস্য পাকিয়া খেত হইতে পৃথক হইয়া স্তূপীকৃত হইয়া যাইবে।

সম্ভবত কোন যুক্তিবাদী ভদ্রলোক এখানে “সম্ভাবনা” আবিষ্কার করিতে পারেন, কাহারও যদি মরিবার ইচ্ছা হয়, তবে বেহেশ্‌তে কি তাহার মৃত্যুও আসিবে?

ইহার উত্তর এই যে, তেমন লোক হয়তো তুমিই হইবে, বেহেশ্‌তে থাকিয়া যাহার মরিতে ইচ্ছা হইবে। আর তো কাহারও তেমন ইচ্ছা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেননা, মরিতে তো দুনিয়াতেও কাহারও মন চায় না। স্বভাবত মৃত্যুকে সকলে না-পছন্দ করে, যদি কাহারও মনে মৃত্যুর কামনা হয়ও, তবে ইহার কারণ হয়তো দুঃখ-কষ্টের আধিক্য, যাহা অসহনীয় হওয়ার কারণে মানুষ মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু বেহেশ্‌তে কোনই দুঃখ-কষ্ট নাই, অথবা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎলাভের আগ্রহাতিশয্যে মানুষ মৃত্যু কামনা করে। বেহেশ্‌তে সেই আগ্রহও পূর্ণ হইয়া যাইবে। কাজেই তথায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা হওয়ার কোনই কারণ নাই।

প্রকৃত উত্তর এই যে, বেহেশ্‌তে যাওয়ার পর মৃত্যুর কামনা মনে আসিতেই পারে না। পরীক্ষা-স্বরূপও এই আকাঙ্ক্ষা মনে আসিবে না। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর বেহেশ্‌তে প্রবেশলাভের পরেই এসমস্ত সুখ-শান্তি উপভোগ করা যাইবে।

**রূহের অবস্থা ঃ** কিয়ামতের পূর্বের অবস্থা এই হইবে যে, রূহের অবস্থানের জন্য আরশের নীচে একটি ফানুস ঝুলান থাকিবে। সবুজ পাখীর আকারে রূহসমূহ উহাতে অবস্থান করিবে। সবুজ পাখীর এই দেহ-পিঞ্জর, উহাদের দেহ বা খাঁচা হইবে না; বরং বাহনস্বরূপ হইবে। যেইখানে যাওয়ার ইচ্ছা হইবে, সেই বাহনে আরোহণপূর্বক উড়িয়া যাইবে। ইহাই আখেরাতের নেয়ামত এবং সুখ-শান্তি, যাহার জন্য আল্লাহওয়ালাগণের অন্তর দুনিয়ার প্রতি বিরূপ।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাদীসে বলিয়াছেন ঃ আমার সহিত দুনিয়ার কি সম্বন্ধ? আর দুনিয়ার সহিত আমার কি সম্পর্ক? দুনিয়াতে তো আমার অবস্থা এইরূপ, যেমন কোন মুসাফির ভ্রমণ করিতে করিতে কোন গাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য দণ্ডায়মান হয়। বলাবাহুল্য, এমতাবস্থায় মুসাফির গাছের সহিত মন লাগায় না, উহাকে নিজের স্থায়ী বাসস্থানও মনে করে না।

কিন্তু আমাদের অবস্থা আক্ষেপের উপযোগী কিনা, এখন চিন্তা করিয়া দেখুন। আমরা দুনিয়ার সহিত মন লাগাইয়া রাখিয়াছি, অথচ এই দুনিয়াকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই বিশ্বাস সকলেরই আছে। কেহই এখানে চিরস্থায়ী নহে। বস্তুত দুনিয়ার সহিত এত অধিক মন লাগাইবার কারণ শুধু এই যে, মানুষ মনে করিয়াছে, মৃত্যুর পরে মানুষ এক সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকে এবং একাকী পড়িয়া থাকে। এই নির্জনতার কল্পনায় মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; বরং মানুষের একটি খারাপ অভ্যাস, অদৃশ্যকে সম্মুখস্থ বস্তুর উপর ধারণা করিয়া এরূপ মনে করে যে, ইহলোকে আমরা যেমন নির্জনতাকে ভয় করি, মৃত্যুর পরেও তদ্রূপই হইবে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই সে মনে করে, মৃত্যুর পরে মানুষ কবরের নির্জন কোঠায় ভয় পাইবে। কিন্তু মৃত্যুর পরে নির্জন কোঠায় আবদ্ধ থাকা এবং নির্জনতাকে ভয় পাওয়া—উভয় কথাই ভুল এবং ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, দেখা গিয়াছে, অনেক সময় নির্জনতায়ই আরাম হইয়া থাকে। যেমন কবি বলেন ঃ

خلوت گزیدہ را به تماشا چه حاجت ست ـ چوں کوئے دوست هست بصحرا چه حاجت ست

“নির্জনতাপ্রিয় স্বভাবের জন্য জনসমাগমের কি প্রয়োজন? যিনি প্রিয়জনের গলি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি মুক্ত প্রান্তর দিয়া কি করিবেন?”

যিনি নির্জনতা ভালবাসেন, নির্জনতার মজা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর। তিনি তোমাদের জনসমাবেশের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন ঃ

ستم ست اگر هوست کشد که بسیر سروسمن درآ ـ تو ز غنچه کم نه دمیدۂ در دل کشا به چمن درآ

"কি অন্যায় কথা! তুমি বাগানে ভ্রমণের জন্য আগ্রহশীল। তুমি তো কোন ফুল অপেক্ষা কম নও। হৃদয়ের দ্বার খোল এবং এই বাগানে আস।"

তথাপি ইহলোকে নির্জনতার পূর্ণ স্বাদ তাহারা এই জন্য উপভোগ করিতে পারে না যে, দেহ-পিঞ্জরটি পূর্ণ নির্জনতার প্রতিবন্ধক। মৃত্যুর পরে এই পিঞ্জর হইতেও মুক্ত হইবে, কাজেই তখন তাহারা নির্জনতার পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করিবে। অর্থাৎ, বন্ধুর একচ্ছত্র রূপসুধা পান করা পূর্ণরূপে ভাগ্যে জুটিবে। ইহাতে এমন স্বাদ, খোদার কসম! অন্য কিছুতেই ইহার সমান স্বাদ নাই। খাকানী বলেন ঃ

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی - که یکدم با خدا بودن به از ملك سلیمانی

"বহু বৎসর পরে খাকানীর এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র সংসর্গের একটি মুহূর্ত সোলায়মান (আঃ)-এর রাজত্ব অপেক্ষা উত্তম।"

নওয়াব শেফতা বলেন ঃ

چه خوش ست با تو بزمے بنهفته ساز کردن - در خانه بند کردن سر شیشه باز کردن

"হে খোদা! তোমার সহিত নির্জনে মিলনের মজলিস কতই না আনন্দদায়ক! যখন ঘরের দরজাও বন্ধ থাকে এবং শরাবের (রহমতের) বোতলও খোলা থাকে।"

আর এক প্রেমিক বলেন ঃ

همه شهر پر ز خوبـاں منم وخیـال مـاهے - چه کنم که چشم بد بیں نه کند بکس نگاهے

"সমগ্র শহর সুন্দরীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু আমি কি করি! কুতসিৎদর্শী (হতভাগা) চক্ষু কাহারও দিকে দৃষ্টিই করে না।"

আমাদের খাজা ছাহেব বলেন ঃ

دل هو وه جس میں کچه نه هو جلوهٔ یار کے سوا - میری نظر میں خاك بهی جام جهاں نما نهیں

"অন্তর বলিতে উহাই, যাহাতে বন্ধুর (আল্লাহ্‌র) নূর ব্যতীত আর কিছুই না থাকে। আমার চোখে সমগ্র জগতের কোন মূল্যই নাই।"

তিনি আরও বলেন ঃ

کسی کی یاد میں بیٹهے جو سب سے بے غرض هو کر - تو اپنا بوریه بهی پهر همیں تخت سلیمان تها

"সবকিছু হইতে সম্পর্কহীন হইয়া কাহারও (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র) ধ্যানে বসিয়া থাকিলে নিজের চাটাইও তখতে সোলায়মানীর সমতুল্য হয়।"

সুতরাং আল্লাহ্‌র দরবারের নির্জনতাকে ভয়ের কারণ মনে করা ভুল। সেই নির্জনতার উপর দুনিয়ার সমস্ত জনসমাবেশ কোরবান। মৃত্যুর পরে মানুষ একাকী নির্জন কোঠায় পড়িয়া থাকে, এ কথা ঠিক নহে। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ মৃত্যুর পরে রূহ রূহের জগতে পৌঁছিয়া যায়। তথাকার অধিবাসী সমস্ত রূহ আগন্তুক রূহ্‌কে সম্বর্ধনা জানায় এবং তাহার নিকট দুনিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করে। অতঃপর বলে, তাহাকে আরাম করিতে দাও, দুনিয়া হইতে ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে।

আমার নানী ছাহেবা এন্তেকালের মুহূর্তে দেখিতে পাইলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) তশরীফ আনিয়াছেন এবং তাঁহাকে বলিতেছেন ঃ 'আমার সঙ্গে চল। রাস্তা পরিষ্কার, কোন ভয় নাই।'

অতএব, বিভিন্ন হাদীস ও ঘটনাবলী হইতে বুঝা যায়, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একাকিত্ব এবং নির্জনতা শেষ হইয়া যায়। মুসলমানের রূহ্ রূহের জগতে যাইয়া হুযূরে আক্‌রাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হয় এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দেখিয়া আনন্দিত হয়। ফলকথা, সেখানে সর্বপ্রকার আনন্দই থাকিবে। প্রত্যেকেই সেখানে এমন আনন্দ লাভ করিবে যে, দুনিয়াতে তাহা কেহ স্বপ্নেও দেখে নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّالَغْوٌ فِيْهَا وَلَاتَاْثِيْمٌ

"বেহেশ্‌তীরা শরাবের পেয়ালা লইয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি করিবে। তাহাতে কোন অশ্লীল উক্তিও হইবে না এবং কোন গালি-গালাজও হইবে না।" এই শান্তির নমুনা দুনিয়াতে কিছু পাওয়া গেলে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের জীবনে পাওয়া যায়। দুনিয়াদারগণ ইহার গন্ধও পায় না।

আমাদের হাজী ছাহেব কেব্‌লাকে যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেনঃ হযরত হাজী ছাহেবের অভ্যাস ছিল, ফজর ও এশরাকের নামাযের পরে তিনি হুজ্‌রা হইতে মিষ্টির হাঁড়ি বাহির করিয়া মাওলানা শেখ মোহাম্মদ এবং হযরত হাফেয মোহাম্মদ যামেন ছাহেবের সঙ্গে বসিয়া মিষ্টি আহার করিতেন। কোন কোন সময় এরূপ ঘটিত যে, তাঁহাদের মধ্যে একজন মিঠাইর হাঁড়ি লইয়া দৌড়াইতেন আর অবশিষ্ট দুই জন উহা তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লওয়ার জন্য পাছে পাছে ছুটিতেন। আজকাল অবশ্য ইহাকে শালীনতাবিরোধী মনে করা হয়। কিন্তু কে জানে, আজকালকার লোকেরা কোন্ কোন্ বিষয়কে শালীনতা মনে করিয়া লইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আজকাল কষ্ট দেওয়ার নামই শালীনতা রাখা হইয়াছে।

মোটকথা, আখেরাতে যেই শান্তি ও শান্তির উপকরণ রহিয়াছে, দুনিয়ায় তাহা সম্ভব নহে। একথাটি স্মরণ রাখিলে কোন আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে শোক-দুঃখ আসিতে পারে না। হাঁ, এই দুঃখ হইতে পারে যে, আমি কেন তথায় পৌঁছিতে পারিলাম না। তোমাদের দো'আ যদি কবূল হয় এবং মৃত ব্যক্তি পুনরায় দুনিয়ায় চলিয়া আসে, তবে আল্লাহ্‌র কসম! সে এখানে থাকা পছন্দ করিবে না; বরং আবার মৃত্যুরই আকাঙ্ক্ষা করিবে এবং তোমাদিগকে তিরস্কার করিবে যে, তোমরা দুনিয়ার সহিত মন লাগাইয়া রাখিয়াছ। আখেরাতকে ভুলিয়া রহিয়াছ। অথচ আমরা এই আক্ষেপ করি—আহা, অমুক আত্মীয় এখন আমাদের মধ্যে থাকিলে সেও আমাদের সঙ্গে আমরূদ এবং আনার খাইতে পারিত। ইহা ঠিক কবির এই উক্তির ন্যায়ঃ

تو نہ دیدی گہے سلیماں را ۔ چہ شناسی زبان مرغاں را

"তুমি কখনও সোলায়মানকে দেখ নাই। তুমি পাখীর ভাষা কেমন করিয়া জানিবে?" অথচ আমাদের অবস্থা এইঃ

چوں آں کرمے کہ در سنگے نہان ست ۔ زمیں وآسماں وی ہمان ست

"পাথরের ভিতরে আবদ্ধ কীট মনে করে, তাহার যমীন এবং আসমান উহাই।"

প্রিয়জনের এন্তেকালে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক, ইহা দূষণীয় নহে। কারণ, ইহা অনিচ্ছামূলক। ইহার যুক্তি এই যে, এই স্বাভাবিক শোক-দুঃখের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পায় এবং তজ্জন্য সওয়াব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই বিলাপ এবং প্রাণ ফাটান কান্নাঃ "আহা! সে সঙ্গীহীন হইয়া গেল, সে আমাদের ন্যায় সুস্বাদু খাদ্য আহার করিতে পাইবে না।"

এসমস্ত বিলাপ ও আক্ষেপ নিরর্থক। আল্লাহ্‌র কসম! সে তোমাদিগ হইতে অধিক আরামে এবং সুখে আছে। তোমরা তাহার চিন্তা করিও না। মুরদাদের সুখ-শান্তির অবস্থা ইহার চেয়ে বিস্তারিত জানিতে চাহিলে আমার রচিত 'শওকে ওয়াতান'* কিতাবটি পাঠ করুন। আমি দাবী করিয়া বলিতে পারি, এই কিতাবটি দেখিবার পরে জীবিত লোকেরা মৃত্যুর জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িবে। মুরদাদের জীবিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর মনে আসিবে না; বরং নিজেদের চিন্তায় মগ্ন হইবে যে, কোন প্রকারে আমরাও পরলোকে কেমন করিয়া পৌঁছিব। সুতরাং আমাদের কেবল এই চেষ্টাই করা উচিত, আখেরাতের শান্তি ও আরাম কিরূপে লাভ করিতে পারি। ইহার পন্থা অদ্যকার আলোচ্য এই আয়াতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার সারমর্ম এইঃ সৌভাগ্য অর্জন কর, নেক আমল কর।

ঘটনাক্রমে আজ যেই স্নেহাস্পদের এন্তেকালে শোক প্রকাশার্থে এই ওয়ায অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার নামও সৌভাগ্যজড়িত। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ সে নিজ নামের ন্যায় "মাস্‌উদ" অর্থাৎ, সৌভাগ্যবানই বটে; সে আখেরাতের সুখ-শান্তি লাভে সফলকাম। যাহাহউক, সুখ-শান্তি লাভের পন্থা হইল নেক আমল দ্বারা সৌভাগ্য অর্জন করা।

**সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের স্বরূপঃ** سعادت 'সাআদাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ সৌভাগ্য। অতএব, অর্থ এই হয় যে, যাহারা সৌভাগ্যশালী তাহারা অনন্তকালের জন্য বেহেশ্‌তে বাস করিবে। ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, বেহেশ্‌তে প্রবেশের জন্য নেক আমলের আবশ্যক নাই; বরং যাহার ভাগ্য ভাল সে-ই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, তাহা হইলে কোরআন ও হাদীস শরীফে নেক আমলের জন্য এত পীড়াপীড়ি এবং পাপ কার্যের জন্য এত শাস্তির ধমক কেন দেওয়া হইল? এই তাকীদ এবং শাস্তির ধমক কি অর্থহীন? কখনই নহে; বরং যাহার তক্‌দীর ভাল তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র দফতরে লিখিত হয়ঃ অমুক ব্যক্তি যেহেতু নেক আমল করিবে, এই কারণে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। সুতরাং যে ব্যক্তি নেক আমল করিবে, সে-ই সৌভাগ্যশালী, আর যে ব্যক্তি মন্দ আমল করিবে, সে দুর্ভাগা। নছীব এবং তক্‌দীর ভাল হওয়া নেক আমলের উপর নির্ভরশীল। ইহাই নিয়ম, ইহাই আইন।

এমনি নিয়মের বিপরীত কাহারও প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ এবং দয়া হইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। তাহাও শুধু আমাদের নিকট নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেননা, আমরা তাহার আমল সম্বন্ধে জ্ঞাত নহি, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট তাহাও নিয়ম-বিরুদ্ধ নহে। কারণ, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির আমল সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। মন্দ আমল সত্ত্বেও যাহাকে তিনি আযাব ব্যতীত বেহেশ্‌তে প্রেরণ করিবেন, বুঝিতে হইবে, তাহার এত বড় কোন নেক আমল আছে যাহা, সমস্ত পাপ কার্যের উপর প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহা জানেন—আমরা জানি না। سعادت (সাআদাত) শব্দের অন্য অর্থও আছে, যাহা অমঙ্গলের বিপরীত। এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত কথার মর্ম এই হয় যে, যাহারা মঙ্গলময়, তাহারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। আর যাহারা অশুভ, অমঙ্গলময় তাহারা দোযখে যাইবে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, প্রকৃত অশুভ কে?

টীকা

---

*এই বিষয়বস্তু নিয়াই আমাদের প্রকাশিত "শেষ বিচারের আগে" পুস্তকখানি দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

যাহারা দোযখে যাইবে কেবল তাহারাই প্রকৃত অশুভ ও অমঙ্গলময়। আর কেহ কুমীর কিংবা উল্লুকে অশুভ বলিয়া থাকে কিংবা গাছকে অশুভ মনে করিয়া থাকে, অথবা কোন কোন দিনকে অশুভ বলে। ইহা কিছুই নহে। মীরাঠের এক বানিয়া সমস্ত অশুভ বলিয়া কথিত ঘোড়া খরিদ করিয়া বিস্তর লাভ করিয়াছে, তাহার জন্য সেই অশুভই ছিল শুভ। কেহ কেহ কোরআন শরীফের এই আয়াত ঃ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ

"অতএব, আমি তাহাদের প্রতি এক প্রচণ্ড বাতাস এমন দিনে প্রেরণ করিলাম, যাহা তাহাদের জন্য অশুভ ছিল" হইতে সন্দেহ পতিত হইয়াছে যে, কোন কোন দিন অশুভও আছে। কিন্তু তাহারা দেখে নাই যে, অপর আয়াতে ايام نحسات -এর তফসীর করা হইয়াছে ঃ سبع ليال وثمانية ايام "একাধারে সাত রাত্রি এবং আট দিন" ইহার সহিত যোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, কোন দিনই শুভ নহে; বরং সমস্ত দিনই অশুভ, অথচ এরূপ কেহই বলে না। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা কোন কোন দিন অশুভ হওয়ার প্রমাণ গ্রহণ করা ঠিক নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে দিনের মধ্যে শুভাশুভ আবিষ্কার করিয়াছে জ্যোতিষীগণ। শীয়া সম্প্রদায় অবশ্য ইহাকে হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত মনে করে, কিন্তু উক্ত রেওয়ায়ত বানোয়াট। শরীঅতে অবশ্য কোন কোন দিন মোবারক বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন দিনই অশুভ নহে। এখন একটি কথা বাকী থাকে, তবে ايام نحسات 'আইয়্যামে নাহেসা'-এর অর্থ কি?

ইহার উত্তরে বলি, ইহার অর্থ—'তাহাদের জন্য অশুভ' অর্থাৎ, ঐদিনগুলি আ'দ সম্প্রদায়ের জন্য অশুভ ছিল। কেননা, সেই দিনগুলিতে তাহাদের উপর আযাব আসিয়াছিল এবং সেই আযাব আসিয়াছিল তাহাদের কুফরী ও অবাধ্যাচরণের কারণে। অতএব, বুঝা গেল যে, সেই অমঙ্গলের মূল হইল তাহাদের কুফরী এবং অবাধ্যাচরণ। যাহাহউক, এই আয়াতেও বুঝা গেল যে, এবাদত ও আনুগত্যের নাম মঙ্গল আর কুফরী ও অবাধ্যতার নাম অমঙ্গল। অমঙ্গল ও অশুভ আমরা? না—পেঁচক ও ঘুঘু ও কলা। বলাবাহুল্য, এসমস্ত বস্তুর কোনই পাপ নাই। কাজেই ইহা কত বড় ভুল যে, আমরা নিজেদের অমঙ্গল অন্য বস্তুর উপর চাপাইতেছি। অতএব, আমাদের অবস্থা ঠিক এইরূপ ঃ

حمله بر خود می کنی اے ساده دل - همچوں آں شیریکه بر خود حمله کرد

"কোন এক সিংহ যেমন নিজে নিজের উপর আক্রমণ করিয়াছিল; হে সরলমতি, তুমিও তদ্রূপ নিজের উপর আক্রমণ করিতেছ।"

**নেক আমলের তওফীক ঃ** এখন আমি আলোচ্য আয়াত সংক্রান্ত কয়েকটি এল্‌মী সূক্ষ্ম কথা বর্ণনা করিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। এখানে 'কামুস' অভিধানটি পাওয়া গেল না, পাইলে দেখিয়া লওয়া যাইত। سَعِدُا শব্দটি যদি সকর্মক ক্রিয়া বলিয়া অভিধানে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, [কামুস অভিধানে দেখা যায় سَعِدَ ও سُعِدَ সকর্মক ক্রিয়া অকর্মক ক্রিয়া, উভয়েরই এক অর্থ, ইহা হইতে اَسْعَدَ সকর্মক রূপ, কিন্তু ইহার اسم مفعول - مَسْعَدٌ নহে مَسْعُوْدٌ এই আভিধানিক প্রমাণটি কেহ হযরত মাওলানার দৃষ্টিগোচর করিলে তিনি বলেন ঃ যদিও سُعِدُوْا সকর্মক ক্রিয়া নহে, কিন্তু সকর্মক ক্রিয়ার রূপধারী। অতএব, যদিও শব্দের দ্বারা আমার ইঙ্গিতকৃত

সূক্ষ্ম রহস্য বুঝা যায় না, তথাপি সকর্মক রূপ হইতে আমার মনে এই সূক্ষ্ম কথাটি এল্হাম হইয়াছে।] তবে আলোচ্য আয়াতে سُعِدُوْا শব্দের কর্মবাচ্য রূপ ব্যবহার করার একটি রহস্য আমার এই মনে হইতেছে যে, ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তোমাকে যে সফলকাম ও সৌভাগ্যশালী করা হইয়াছে, তাহাতে তোমার কোন কৃতিত্ব নাই; বরং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে ইহা তোমার প্রতি অনুগ্রহই অনুগ্রহ। কেননা, সৌভাগ্য যদিও নেক আমলের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু নেক আমলের তওফীক শুধু আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহেই হইয়া থাকে। আপনার নামাযের যে আগ্রহ হয়, রাত্রে আপনি যে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া থাকেন, তাহা আপনার কাজ নহে; বরং অন্য এক শক্তি আপনাকে উঠাইতেছে, সুতরাং আমাদের অবস্থা এইরূপ ঃ

رشتـه در گردنـم افگنـده دوست - می برد هر جا که خاطر خواه اوست

"বন্ধুর মহব্বতের শিকল আমার ঘাড়ে পতিত রহিয়াছে, তিনি যেখানে ইচ্ছা আমাকে টানিয়া নিয়া যান।" سُعِدُوْا শব্দে কর্মবাচ্য রূপের এই রহস্য।

**দুইটি এল্মী সূক্ষ্ম কথা ঃ** অতঃপর مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ বাক্যটি সম্বন্ধে দুইটি সূক্ষ্ম কথা বলিতেছি। ইহার উপর বাহ্যদৃষ্টিতে সন্দেহ হয় যে, যতদিন আসমান-যমীনের অস্তিত্ব থাকিবে, বেহেশ্‌তিগণ বেহেশ্‌তে ততদিন থাকিবে। অথচ আসমান-যমীনের স্থায়িত্ব সীমাবদ্ধ। ইহাতে বুঝা যায়, বেহেশ্‌তিগণের বেহেশতে অবস্থান এক নির্দিষ্ট কালের সহিত সীমাবদ্ধ।

ইহার উত্তর শুনুন। এস্থলে আসমান-যমীন বলিতে বেহেশ্‌তের আসমান-যমীন উদ্দেশ্য, দুনিয়ার আসমান-যমীন উদ্দেশ্য নহে। এখন অর্থ এই হইল যে, বেহেশতিগণ বেহেশ্‌তে স্থায়ীভাবে বাস করিবে, যে পর্যন্ত বেহেশ্‌তের আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকিবে। যেহেতু বেহেশ্‌তের আসমান ও যমীন অনন্তকাল স্থায়ী থাকিবে, কখনও ধ্বংস হইবে না, সুতরাং বেহেশ্‌তিগণের বেহেশতে অবস্থানও আর সীমাবদ্ধ হইল না। যে সমস্ত আয়াতে خالدين فيها ابدا উল্লেখ আছে, সে সমস্ত আয়াত হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বেহেশ্‌তের আসমান ও যমীন অনন্ত স্থায়ী, আর যে হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

يا اهل الجنة خلود ولاموت - ويا اهل النار خلود ولاموت

"হে বেহেশ্‌তিগণ! অনন্তকাল বাস করিতে থাক, আর মৃত্যু নাই; হে নরকবাসীরা! অনন্তকাল ইহাতে থাক, আর মৃত্যু নাই," উক্ত হাদীস দ্বারা বেহেশ্‌ত-দোযখের অনন্ত স্থায়িত্ব বুঝায়।

এখন একটি কথা এই থাকে যে, তবে مادامت السموات والارض বলার প্রয়োজনই কি ছিল? ইহার উত্তর এই যে, যেমন কোন ব্যক্তিকে পুরস্কারস্বরূপ একটি গ্রাম দান করিয়া বলা হয়, যতদিন এই গ্রামের অস্তিত্ব আছে, ততদিন পর্যন্ত তুমি ইহার মালিক থাকিবে। এই ধরনের কথায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয় যে, ইহা আমার নিকট হইতে কেহ কখনও কাড়িয়া নিবে না। এস্থলে مادامت السموات والارض যোগ করার উদ্দেশ্যও ইহাই।

অতঃপর اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ সম্বন্ধে একটি সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, خالدين فيها বাক্যের ব্যাপকতা হইতে اِلَّامَاشَآءَ رَبُّكَ -কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই মর্মে অনুবাদ এই হয়—"সৌভাগ্যশালীগণ সর্বদার জন্য বেহেশ্‌তে থাকিবে, কিন্তু খোদা যখন

ইচ্ছা করেন।” ইহাতে সন্দেহ হয় যে, হয়তো কোন এক সময়ে চিরকালের জন্য বেহেশতে অবস্থান বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে অথবা পড়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।। ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি, اِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ কথাটি خالدين فيها বাক্যের ব্যাপকতা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই; বরং اَلَّذِيْنَ سُعِدُوْا অর্থাৎ, যাহারা সৌভাগ্যবান—পদের ব্যাপকতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে اِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ এবং ما শব্দটি এখানে من -এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সারমর্ম এই—যাহারা সৌভাগ্যবান তাহারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। কিন্তু যাহাকে খোদা ইচ্ছা করিবেন না সে বেহেশ্‌তে যাইবে না। অর্থাৎ, কোন কোন আমলকারী এমনও আছে, যাঁহাদিগকে আমরা সৌভাগ্যবান মনে করি, কিন্তু খোদার নিকট তিনি সৌভাগ্যবান নহেন। আল্লাহ্‌র শপথ, এই কথাটি সূফিগণের কোমর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কেননা, কাহারও নিশ্চয়তামূলক খবর নাই যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে কিরূপ আছেন। تا يار كرا خواهد وميلش بكه باشد “প্রিয়জন কাহাকে চায় এবং তাহার আকর্ষণ কাহার দিকে হয় কে জানে।”

সূরা-আ'রাফের এক আয়াতে ইব্‌নে-আব্বাস (রাঃ) الا ماشاء الله বাক্যে ما শব্দটিকে مَنْ -এর অর্থে বলিয়াছেন। এই আয়াতদ্বয়ে বাহ্যিক কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং এখানেও ما -কে من -এর অর্থে বলায় কোন ক্ষতি নাই! অতঃপর বেহেশ্‌তিগণের বেহেশতে চিরস্থায়ী অবস্থান সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেননা, এখানে চিরস্থায়ী অবস্থান হইতে اِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ কথাটিকে বাদ দেওয়া হয় নাই।

মাওলানা শাহ্ আবদুল কাদের ছাহেব (রঃ) এই আয়াতের অন্যরূপ এক তফসীর করিয়াছেন, যাহা খুবই বিচিত্র। সেই ব্যাখ্যার প্রতি কাহারও কল্পনা পৌঁছিতে পারে না। উহার সারমর্ম এই—الا ماشاء ربك কথা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা নিজের চিরস্থায়িত্ব এবং বেহেশ্‌তবাসিগণের চিরস্থায়িত্বের পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, খোদা তা'আলার চিরস্থায়িত্ব কাহারও ইচ্ছার অধীন নহে, কিন্তু বেহেশ্‌তিগণের চিরস্থায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন। الاماشاء ربك বাক্যে শুধু এতটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, বেহেশ্‌তিগণের চিরস্থায়িত্ব স্বয়ংসম্পন্ন নহে; বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন। ইহার অর্থ এই নহে যে, তাঁহাদের বেহেশতে চিরস্থায়িত্ব কোন সময় লোপ পাইবে। কেননা, অন্যান্য আয়াতে একথা জানা গিয়াছে যে, বেহেশ্‌তবাসীদের চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা কখনও পরিবর্তন হইবে না। কাজেই তাঁহাদের চিরস্থায়িত্বও কোন সময় লোপ পাইবে না।

কিন্তু শাহ ছাহেবের উদ্দেশ্য তাঁহার এবারত হইতে সকলে বুঝিতে পারিবে না; সেই ব্যক্তি বুঝিবে, যে ব্যক্তি অবগত আছে যে, এখানে একটি সন্দেহ আছে, শাহ ছাহেব উহার নিরসন করিতেছেন। বাস্তবিকপক্ষে শাহ ছাহেব বড় সহজে ও সংক্ষেপে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অগাধ জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এক আর্য পণ্ডিত প্রশ্ন করিয়াছিল—খোদার অস্তিত্বও অসীম, অনন্ত এবং বেহেশ্‌তীদের অস্তিত্বও অসীম অনন্ত। তবে তো উভয়ে সমকক্ষ হইয়া গেল। এরূপ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, খোদার অস্তিত্ব কালের পরিপ্রেক্ষিতে অসীম, অনন্ত। আর বেহেশ্‌তিগণের অস্তিত্ব অনন্ত হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁহাদের অস্তিত্ব লোপ করা হইবে না। কিন্তু শাহ ছাহেবের উত্তর সর্বাপেক্ষা উত্তম। তিনি বলিয়াছেনঃ খোদার অস্তিত্ব সত্তাগতভাবে অনন্ত। আর বেহেশ্‌তীদের অস্তিত্ব অপরের দ্বারা অনন্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত এই কয়েকটি সূক্ষ্ম কথা বর্ণনা করিলাম। এখন আয়াতের সারমর্ম বর্ণনা করিয়া বক্তব্য সমাপ্ত করিব।

সারকথা এই হইল যে, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে আখেরাতের সুখ-শান্তির প্রতি মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন, যেন আমরা উহার বিষয় স্মরণ রাখিয়া আখেরাতের প্রতি উৎসাহী ও আগ্রহশীল হই এবং উহার জন্য চেষ্টা করি। আখেরাতের সুখ-শান্তি হাছিল করিবার পন্থা এই বলিয়া দিয়াছেন যে, আমরা সৌভাগ্য অর্জন করি অর্থাৎ, নেক আমল করিতে থাকি। এখান হইতে আমি তালেবে এল্‌মদের সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তাহারা নিজ নিজ সংশোধনের প্রতি লক্ষ্য করুন। কেননা, আমি দেখিতেছি, আলেমগণ আজকাল এল্‌ম শিক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন। আমলের প্রতি গুরুত্ব দেন না এবং আমলের পূর্ণতালাভে যত্নবান হন না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এতদসত্ত্বেও তাহারা নিজদিগকে নায়েবে রাসূল (দঃ) মনে করিয়া থাকেন। এই আমলশূন্য এল্‌ম দ্বারাই তাহারা নায়েবে নবী হওয়ার দাবী করিতেছেন? এই আমলশূন্য এল্‌মের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন ঃ

علم رسمی سربسر قیل است قال - نے ازو کیفیتے حاصل نہ حال
علم چه بود آں که ره بنمایدت - زنگ گمراهی ز دل بزدایدت
ایں هوس ها از سرت بیروں کند - خوف وخشیت در دلت افزوں کند
تو ندانی جز یجوز ولا یجوز - خود ندانی که تو حوری یاعجوز
علم نبود غیر علم عاشقی - ما بقی تلبیس ابلیس شقی
علم چوں بر دل زنی یارے شود - علم چوں بر تن زنی مارے شود

অর্থাৎ, "রস্‌মী এল্‌ম শুধু দলিল—প্রমাণের সমষ্টি। ইহা দ্বারা অবস্থাও হাছিল হয় না, অবস্থার খবরও পাওয়া যায় না। ইহাতে ভ্রান্তি দূর হয় না। এল্‌ম অন্তরে ক্রিয়া করিলে বন্ধু হয়। উহার ক্রিয়া যদি দেহ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সাপ হয়।"

**সত্যিকারের এল্‌ম ঃ** যে এল্‌ম আল্লাহ্ তা'আলার মা'রেফত লাভ হয় তাহাই সত্যিকারের এল্‌ম, তাহা আমল ভিন্ন লাভ করা যায় না। সুতরাং আমলবিহীন এল্‌ম মূর্খতার সমতুল্য।

علمے که ره حق نه نمایدت جهالت ست

"যে এল্‌ম তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ প্রদর্শন করে না তাহা মূর্খতা।"

ফলকথা, নিছক এল্‌মের উপর পরিতৃপ্ত হওয়া বড় ভুল। ওলামা এবং তোলাবাগণেরও আমলের প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। তাহাতেই তাঁহাদের সৌভাগ্য লাভ হইবে। আজিকার ওয়াযের মজলিসে যেহেতু ওলামা এবং তোলাবাও উপস্থিত আছেন, সুতরাং তালেবে এল্‌মগণের প্রয়োজনে এই বিষয়টি বর্ণনা করিলাম। সারকথা এই যে, দুনিয়া এবং আখেরাতের শান্তি কামনা করিলে নেক আমলের দ্বারা সৌভাগ্য অর্জন কর। এমন সৌভাগ্য অর্জন কর, যাহাতে প্রথমবারেই বেহেশ্‌তে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হও এবং আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ সান্নিধ্য লাভ হয়। এল্‌মের সহিত আমল থাকিলেই তাহা এল্‌মে দ্বীন বলিয়া গণ্য হয়, যদিও শুধু এল্‌ম কিংবা শুধু আমলেও সৌভাগ্যের এক স্তর লাভ করা যাইতে পারে। কেননা, শুধু নাজাতের জন্য

ঈমান এবং ইসলামই যথেষ্ট। কিন্তু নিম্নস্তরের উপর ক্ষান্ত থাকা বা তৃপ্ত থাকা মহাভুল। কেননা, পরলোকের সামান্য আযাবও মহাযন্ত্রণাময়। আল্লাহ্‌র শপথ, তাহা বরদাশ্‌ত করিতে পারিবে না। সুতরাং পূর্ণ সৌভাগ্য অর্জনের চেষ্টা কর। ইহা তখনই লাভ হইবে যখন দ্বীনী এল্‌মও শিক্ষা করিবে এবং তৎসঙ্গে আমলের প্রতিও গুরুত্ব দিবে।

এখন মরহুমের জন্য দো'আ করুন। আল্লাহ্ যেন তাঁহাকে আখেরাতের সুখ-শান্তি এবং তাঁহার জীবিত আত্মীয়-স্বজনকে ছবর ও শান্তি দান করেন।

আমি আশাকরি, ইন্‌শাআল্লাহ্, আমার এই বর্ণনায় তাঁহাদের শোকাতুর হৃদয়ে সান্ত্বনা আসিয়াছে। এই বিষয়টিকে চিন্তা করিতে থাকিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ তাঁহাদের হৃদয়ে পূর্ণরূপে সান্ত্বনা ও শান্তি আসিবে। ইহার সঙ্গে আরও একটি তদবীর আছে—মরহুমের রোগ এবং এন্তেকাল সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিবেন। কেননা, সেই আলোচনায় মনে নূতন করিয়া আঘাত লাগিবে।

এখন আমি শেষ করিতেছি। দো'আ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে পূর্ণ সৌভাগ্য সুস্থ বোধশক্তি, এল্‌ম ও সুষ্ঠু আমলের তওফীক দান করুন। আমীন!

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

■ সমাপ্ত ■

মুজাফ্‌ফরনগর
১৬ই শাবান, ১৩৩৭ হিজরী